বিশাল বাঙ্গলা

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়
লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়



সরস্বতী লাইব্রেরী
কলিকাতা

সরস্বতী লাইব্রেরী
সি ১৮-১৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা

—গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক—

দরিদ্রের ক্রন্দন	নিদ্রিত নারায়ণ	বিশ্বভারত
বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য	শাশ্বত ভিখারী	পল্লীসেবক
বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী	শিক্ষা প্রচার	মণিমেখলা

এক টাকা

প্রকাশক : শ্রীবীরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত
মুদ্রাপক : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ৩২ আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা

ভূমিকা

দক্ষিণ-পশ্চিমে ছোটনাগপুরের লোহিত, বন্ধুর উপত্যকা ও তালীবন-বেষ্টিত সাগরকূলের বালেশ্বর, উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের সানুদেশে ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া, এবং পূর্ব্বদিকে আসামের সুরমা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের বিপুল বারিধারা-প্লাবিত সমতল উদ্যান ও স্নিগ্ধ বনানী বাঙ্গলার সীমানা। বাঙ্গলার ইহাই প্রাকৃতিক পূর্ণাবয়ব।

ভূগোল, ভাষা ও ইতিহাস যে বাঙ্গলাকে সৃষ্টি করিয়াছে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর ধূর্ত্ত চালে আজ তাহা খণ্ডবিখণ্ডিত। বাঙ্গলার রাষ্ট্রের সঙ্গে উহার সমাজ ও কৃষ্টির নাড়ীর বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়াছে। রাষ্ট্র তাই সংগঠনের অবলম্বন না হইয়া সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষম অশান্তি ও অসদ্ভাব আনিয়া দিয়াছে। রাষ্ট্র পুনরায় বিশাল বাঙ্গলার প্রতীক না হইলে অদূরবর্ত্তী ভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্রবিন্যাসে বাঙ্গালী শুধু যে তাহার উপযুক্ত দান দিতে অক্ষম হইবে তাহা নহে, ভারতীয় সংগঠনকে তাহার দ্বন্দ্বের দ্বারা দুর্ব্বল করিয়া দিবে।

বাঙ্গলার বিচিত্র জাতি উপজাতি, পশ্চিমের কত অঞ্চল হইতে গঙ্গানদীর শাখা-প্রশাখা বাহিয়া আসিয়া আজ বাঙ্গলার উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্রে তাহাদিগের যুদ্ধ-অভিযানের অতীত ইতিহাস সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর জাতিস্মরতা না আসিলে জাতির ও ব্যক্তির পূর্ণ মর্য্যাদাবোধ আসিবে না, উচ্চ ও অনুচ্চ জাতির সামাজিক ব্যবধানও ঘুচিবে না। জনসমাজে ধর্ম্ম বা

আচার লইয়া জাতি বা সম্প্রদায়ের ব্যবধান বাঙ্গলার যুগ-পরম্পরা-অর্জ্জিত সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত নিতান্ত অসঙ্গত। যুগে যুগে বাঙ্গলার ক্ষণভঙ্গুর, পিচ্ছিল পলিমাটিতে জাতির বা মানুষের ঐক্য ও সদ্ভাবকে অস্বীকার করিয়া কোন সমাজ-সৌধ, কোন উচ্চ বাঁধ টিকিতে পারে নাই। বরং গঙ্গানদীর বিস্তৃত ব-প্রদেশে বহুজাতির রক্ত ও কৃষ্টি সংমিশ্রণে যে সমতা- ও মানবিকতা-মূলক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রভাব পূর্ব্ব এশিয়া ও দ্বীপময় ভারতে আজও প্রতিভাত।

পাশ্চাত্য সভ্যতার তামস যুগে একবার বিশাল বাঙ্গলাকে কেন্দ্র করিয়া সভ্যতার স্নিগ্ধ উজ্জ্বল গগনস্পর্শী শিখা সমগ্র জগৎকে আলোকিত করিয়াছিল। মানুষ তখন বাঙ্গলা ভূমিতে একটা গরিমময় মহান্ জীবন যাপন করিয়াছিল, যেমন সে করিয়াছিল পেরিক্লীসের যুগে এথেন্সে, অথবা এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডে। ঐ যুগে চীন প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের বহুলোক জগৎপ্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্তি বন্দরে অবতরণ করিয়া বিশাল বাঙ্গলার বহু মঠে ও সংঘারামে অধ্যয়ন করিতে আসিত; মহাযান ও বজ্রযান ধর্ম্ম সমস্ত পূর্ব্ব ভারত জুড়িয়া একটা ভাবুকতার বিপুল বন্যা আনিয়া দিয়াছিল এবং পাল ও সেন আমলে বাঙ্গালীর চারুশিল্পকলা নেপাল, তিব্বত, শ্রীক্ষেত্র, যবদ্বীপ, শ্যাম, কাম্বোজে তাহার অতুলনীয় শালীনতা ও মরমীয়তার ছাপ প্রদান করিয়াছিল। বিশাল বাঙ্গলার সংস্কৃতির উহা একটী চিরস্মরণীয় পূর্ণকুসুম-বিকাশের যুগ।

তাহার প্রায় চারি শত বৎসর পরে ইউরোপীয় বণিক এশিয়াখণ্ডে প্রথম আসে মশলা বাণিজ্যে ঐহিক লাভ ও খৃষ্টান করিয়া স্বর্গলাভের আশায়। ফিরিঙ্গীরা মশলা বাণিজ্য একচেটিয়া রাখিয়াছিল প্রায় দেড় শতাব্দী ধরিয়া। কিন্তু পোর্টুগাল হইতে সোণারূপা প্রাচ্যদ্বীপপুঞ্জে রপ্তানি না করিয়া মশলা বাণিজ্য সম্ভবপর হইত না। যখন ফিরিঙ্গী সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত সমুদ্রপথ দখল করিয়া বসিল তখন বিশাল বাঙ্গলারই চাউল, ঘি, তৈল, চিনি ও কাপড়ের বিনিময়ে দ্বীপপুঞ্জ হইতে সে মশলা সংগ্রহ আরম্ভ করিল; সোণারূপার তখন আর প্রয়োজন হইল না। এইরূপে বাঙ্গলারই সম্পদ ইউরোপীয় বণিকের প্রাচ্য বাণিজ্য প্রসারের বিশেষ সহায় হইয়াছিল। এই জন্যই ফিরিঙ্গীর সহিত ওলন্দাজের, এবং পরে ওলন্দাজ, ইংরাজ এবং ফরাসীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয় বঙ্গোপসাগরে আধিপত্য লাভের জন্য। এদিকে শুধু ফিরিঙ্গীর নহে, ওলন্দাজ ও ইংরাজের জলদস্যুতা বাঙ্গালী সদাগরের সমুদ্র-বাণিজ্য নষ্ট করিয়া দিল। দিল্লীর বাদশাহ ও মুর্শিদাবাদের নবাব তাহার প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। বরং উঁহারা বিদেশী বণিককে বহু বাণিজ্য-সুবিধা ও শুল্ক-মাশুল হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়া দেশীয় বণিকের ধ্বংসের পথ সুগম করিয়া দিলেন। বাঙ্গলার বণিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এইরূপে একেবারে দরিদ্র ও নির্ম্মূল হইয়া গেল।

পলাশী যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গলার সমাজগ্রন্থি একেবারে শিথিল হইয়া গিয়াছিল। ঢাকা বা কাশিমবাজারের কার্পাস ও

রেশমের বস্ত্রশিল্প যাহা ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধুনিক ল্যাঙ্কাশায়ারের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল এবং শুধু এশিয়াখণ্ডের দ্বীপময় ভারত, চীন, পারস্য, মিশর, তুর্কীতে নহে ইউরোপেও অতিপরিচিত ছিল, তাহা মৃতপ্রায়। বাঙ্গালী সদাগরের ভারতীয় ও আরব সাগরের পুরাতন বহির্বাণিজ্যও ইউরোপীয় বণিক ও জলদস্যুর অত্যাচারে বিধ্বস্ত। ইংরাজ বিশাল বাঙ্গলার সম্পদ ও লোকবলে বলীয়ান্ হইয়া নদীপথে শুধু যে ভারতজয়ের অভূতপূর্ব্ব সুবিধা পাইয়াছিল তাহা নহে। বাঙ্গলার লুণ্ঠিত ধনই ইংরাজের শিল্পবিপ্লব, আমেরিকায় উপনিবেশ ও জগদ্বাণিজ্য স্থাপনেরও প্রধান সহায় হইয়াছিল।

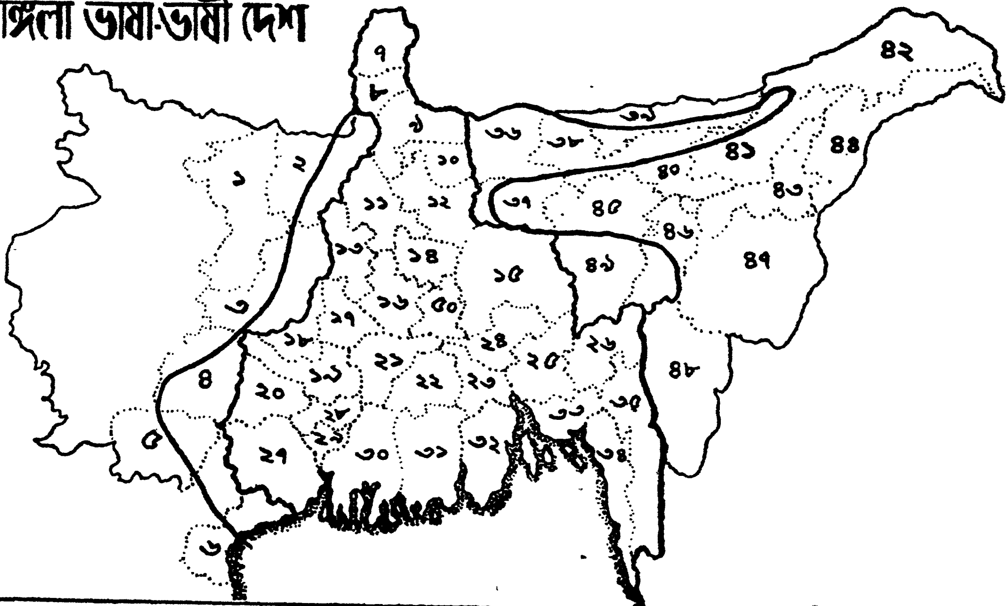
তাহার পর জাতির উত্থান-পতনে আর এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে। আজ বাঙ্গালী আবার তাহার সৃষ্টিকুশলতা ও সমাজ-বিন্যাস গঠন করিবার নূতন সুযোগ পাইয়াছে। বাঙ্গালী মস্তিষ্ক যে দ্রুতগতিতে বর্ত্তমান বিশ্বসভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে আশা হয় আধুনিক যুগে বিশ্বসভ্যতায় মরমী বাঙ্গালীর মানবিকতা ও সমদর্শনের দানও কম হইবে না। বিশাল বাঙ্গলার এই বিচিত্র ছবি বৃহৎ পটভূমিতে সরল রেখায় টানিয়া আঁকিয়াছি এই প্রতীক্ষায় যে যুবক বাঙ্গালী ইহাতে তাহার জাতীয় আশা ও উদ্যমের উপকরণ কিছু পাইবে।

আশ্বিন, ১৩৫২
গোয়ালিয়ার

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

সূচী

বাঙ্গলার অবদান ... ১
বাঙ্গলার অধোগতি ... ১৯
পাশ্চাত্য প্রভাব ... ২৫
বাঙ্গলার বিপর্য্যয় ... ৩৬
সমস্যা ও সমাধান ... ৪৮



১ ভাগলপুর ২ পূর্ণিয়া ৩ সাঁওতাল পরগনা ৪ মানভূম ৫ সিংহভূম ৬ বালেশ্বর ৩৬ গোয়ালপাড়া ৩৭ গারো পাহাড়
৩৮ কামরূপ ৩৯ ডারাং ৪০ নগাঁও ৪১ শিবসাগর ৪২ লখিমপুর ৪৬ কাছাড় ৪৯ শ্রীহট্ট

বিশাল বাঙ্গলা

বাঙ্গলার অবদান

গঙ্গা ও পার্ব্বতী

গোমুখীর তুষার-নির্ঝর হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গানদী যুগের পর যুগ বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, তুর্কী, ইংরাজী সংস্কৃতি বহন করিয়া আজ তাহার সলিলবক্ষে কত না যুদ্ধ-অভিযান, কত না চারুশিল্পকলা ও বাণিজ্যের গৌরব-স্মৃতি ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গানদী ভারতীয় সংস্কৃতির অভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতি সংমিশ্রণের প্রতীক। ভারতের মনোময় জগতেও গঙ্গার প্রভাব কম নহে। গঙ্গা ও পার্ব্বতী ভারতীয় জনগণমনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ভারতীয় সভ্যতার মহেশ্বর আপনার জটাকলাপের মধ্যে ধারণ করিয়াছেন তাঁহার প্রিয়-সহচরী গঙ্গাকে। ইহা হইতেছে গঙ্গা-মাহাত্ম্য। যুগযুগান্ত-কাল প্রবহমাণা গঙ্গা নদীর প্রতি "মাতর্গঙ্গে" ভারতবাসীর যুগপরম্পরার্জ্জিত সশ্রদ্ধ অভিবাদন। কিন্তু এই গাঙ্গেয় ভূমিতে যখন গঙ্গা প্রবাহিত হয় নাই এবং হিমালয় পর্ব্বত-রাশিও মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই তখন আর এক নদী প্রবাহিত ছিল যাহার নাম সরস্বতী। যজুর্ব্বেদে এই নদীর

উল্লেখ আছে পঞ্চনদীসমেত, এবং মহাভারতে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে সপ্তনদীর সহিত। আরও বর্ণনা আছে যে ঐ নদী পশ্চিম ভারতে প্রভাসে গিয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতের উৎপত্তিকালে ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন ইণ্ডো-ব্রহ্ম বলিয়া এক নদী ছিল। হিমালয় পর্ব্বতের উত্থানের সঙ্গে ভূগর্ভে যে আলোড়ন উপস্থিত হয় তাহার ফলে সরস্বতী নদীবর্গ বিখণ্ডিত হইয়া পড়ে। পশ্চিমগামিনী সরস্বতী প্রভাস পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়া তখন মরুপথে হারাইয়া গেল। বশিষ্ঠ-সংহিতা ও বৌধায়নে বর্ণনা আছে যে মরুভূমিতে বীণাসন নামক স্থানে ঐ নদী বিলীন হইয়া যায়। এখনও পশ্চিম পাঞ্জাব ও রাজপুতানার স্থানে স্থানে এই নদীর জীর্ণ কঙ্কাল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সরস্বতীর একটি বিচ্ছিন্ন ধারা পূর্ব্বগামিনী হইল,—ইহারই নাম গঙ্গা, এবং এই নদী যমুনার (যাহা প্রাগৈতিহাসিক যুগে পশ্চিম দিকে বহিত) ধারা বিপরীত করিয়া নিজ সাথে লইয়া চলিল। মহাভারতে আমরা পড়ি, গঙ্গা সমুদ্রে মিলিবার পূর্ব্বে যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু, অপায়, সরযূ ও গণ্ডক এই সপ্তনদীর সহিত মিলিত হইয়াছিল।

এই সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। তখন পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভব হয় নাই। তারপর কত যুগ চলিয়া গেল, কত যুগ ধরিয়া মৃত্তিকার স্তরের উপর মৃত্তিকা স্থাপন করিয়া নদী সমুদয় এই বিশাল সমতল ভূমি গড়িয়া তুলিতে লাগিল। ক্রমে আদিম মানুষও আসিল। কিন্তু ধরণীর বুকে সে কোনও ছাপ, কোন নিদর্শন, কোন সঙ্কেত দিয়া যাইতে পারে নাই।

পৃথিবীতে যখন প্রথম সভ্যতা দেখা দেয়,নীল ও ইউফ্রেটিস নদীতটে, সে সময়ে ভারতবর্ষেও সিন্ধুনদের সমতল ভূমিতে এক সুশোভন, সমৃদ্ধিশালী নাগরিক সভ্যতা বিকাশ লাভ করিয়াছিল। মহেঞ্জোদারো-হারাপ্পার এই সভ্যতা গঙ্গা-যমুনা-দোয়াবের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া পূর্ব্ব দিকে ক্রমে অগ্রসর হয়। বিহার প্রদেশের মৌর্য্যীয় স্তরের আরও ১৩ ফুট নিম্নে ভূগর্ভে সিন্ধু সভ্যতার অনুরূপ পোড়া মাটির তৈয়ারী আগ্ন্যা-জননীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমের বৃষ, নাগ ও লিঙ্গ পূজা ক্রমশঃ গাঙ্গেয় ভূমিতে ছড়াইয়া পড়ে।

সৈন্ধব, বৈদিক ও নিষাদীয়

তারপর আরও এক যুগ অতিবাহিত হইল। তখন গাঙ্গেয় ভূমিতে ঋগ্‌বৈদিক আর্য্যেরা সমাগত। বৈদিক সভ্যতার সহিত সিন্ধু সভ্যতার সংঘর্ষ হইয়াছিল ; তাহার পর সম্মিলনও হইয়াছিল। যমুনার কূলে খাণ্ডবদাহ এবং তক্ষকপ্রমুখ নাগদিগের বিতাড়ন দুই সভ্যতার মধ্যে হিংস্র বিরোধের সাক্ষ্য দেয় ; অপর দিকে অর্জ্জুনের সহিত নাগকন্যা উলূপী ও ভীমের সহিত রাক্ষস কন্যা হিড়িম্বার বিবাহ দুই বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণেরও পরিচয় দেয়। গাঙ্গেয় ভূমির উপরিভাগে যখন বৈদিক সভ্যতা বিস্তৃত হয় তখন বঙ্গের অধিবাসীদিগকে আর্য্যেরা খুবই হীনচক্ষে দেখিত। মহাভারতে পূর্ব্ব অঞ্চলের লোকদিগকে ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে এবং ভাগবতপুরাণে কিরাত, হুন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, যবন এবং খাসদিগের সহিত সুহ্মদিগকে "পাপগণ" বলিয়া

আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে নিষাদ হইল বাঙ্গালীর আদিম সাধারণ নামকরণ। বৌধায়নে উল্লেখ আছে, পুণ্ড্র ও বঙ্গদিগের মধ্যে গমন করিলে ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

যেমন সুদূর পশ্চিমে সিন্ধু সভ্যতা এবং মধ্য প্রদেশে আর্য্য সভ্যতা, তেমনি গাঙ্গেয় ভূমির পূর্ব্বপ্রান্তে যাহারা আদিম অধিবাসী এবং যাহারা বৈদিক সভ্যতায় দস্যু ও ম্লেচ্ছ বা নিষাদ নামে খ্যাত হইত তাহাদিগের সংস্কৃতির ধারা বিভিন্ন ছিল। পশ্চিমে মির্জ্জাপুর ও রেওয়া হইতে পূর্ব্বদিকে হুগলি, চট্টগ্রাম এবং আসামের সমতলভূমি পর্য্যন্ত দিকে দিকে নানা প্রকার সুচিক্কণ তীরফলক, প্রস্তরের অস্ত্র-শস্ত্র ও মসৃণ মৃত্তিকা-শিল্প উপাদান পাওয়া যায়। সমগ্র গাঙ্গেয় ভূমির, এমন কি খুব সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতবর্ষের, প্রাচীনতম অধিবাসী অষ্ট্রিক-ভাষী নিষাদেরা নব্য-প্রস্তরযুগের সভ্যতার সাক্ষী। পরে ইহারাই আবার তাম্রযুগের প্রবর্ত্তক। ভারতীয় সভ্যতার আদিম কাঠামো ও উপকরণ ইহাদেরই দান। সৈন্ধব ও বৈদিক আর্য্য সভ্যতা পর পর ইহারই ভিত্তিতে সুশোভন ও সুসমঞ্জস সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

এই আদিম নিষাদ-আখ্যাত জাতির সঙ্গে খুব সম্ভবতঃ প্রশান্ত মহাসাগরের নারিকেল-দ্বীপপুঞ্জের সংস্কৃতির যোগ ছিল। ইহারাই ভারতবর্ষকে যেমন কৃষির বিষয়ে ধান্য চাষ, জল সেচ, পর্ব্বতগাত্রে বাঁধ বাঁধিয়া ক্ষেত্র স্থাপন প্রভৃতির শিক্ষা দান করিয়াছে, তেমনি দান করিয়াছে ভারতবর্ষের সমাজ-বিন্যাসে পঞ্চায়ত শাসন ও গ্রাম্য সমাজের সমূহতন্ত্র। ধর্ম্ম-

জীবনে ও লোকাচারে ইহাদেরই নিকট ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে গ্রাম্যদেবতা ও অরণ্যদেবীর পূজা, যাবতীয় যৌগিক মন্ত্র তন্ত্র, শক্তি সাধন ও সিদ্ধি, বিবাহ অনুষ্ঠানে সিন্দুর, নারিকেল ও হরিদ্রার ব্যবহার এবং আরও নানাবিধ লৌকিক বিধি-নিষেধ। বাঙ্গালার লোকাচারের প্রায় সবই আমরা পাইয়াছি এই প্রচ্ছন্ন, অবজ্ঞাত ও বহুপ্রসারিত কৃষ্টি হইতে।

পশ্চিমের বিজিত জাতির বাঙ্গলায় প্রসার

গঙ্গা-যমুনার পথ বাহিয়া যুগে যুগে বহু সভ্য ও বিজয়ী জাতি পর পর আসিয়া আদিম অধিবাসিগণকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ক্রমশঃ গাঙ্গেয় ভূমির পূর্ব্ব অঞ্চলে বিতাড়িত করিয়াছে। বাঙ্গলার কৃষ্টি ও ইতিহাস অনেকটা এই বিতাড়নের ইতিহাস। নানা যুগের বহু জাতির কৃষ্টি ও রক্ত সংমিশ্রণের ফলে বাঙ্গলার সভ্যতার অসাধারণ নমনীয়তা ও বৈচিত্র্য। আশ্চর্য্য এই যে বাঙ্গলার আদিম জাতিগুলি তাহাদিগের পূর্ব্ব গৌরব ও সম্পদ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু যুক্তপ্রদেশে তাহাদিগের স্বজাতিগণ এই গৌরব ভুলে নাই। সমস্ত যুক্তপ্রদেশে বিশেষতঃ অযোধ্যা, মির্জ্জাপুর, কাশী ও গোরক্ষপুর অঞ্চলে 'ভড়', 'শবর', 'চেরো' ও 'কৈবর্ত্ত'দিগের বহু পুরাতন অনেক দুর্গ ও ভগ্নস্তূপ দেখা যায়। ইহাদিগের মধ্যে ভাগবতপুরাণে আভীরদিগের উল্লেখ আছে। এদিকে যুক্তপ্রদেশের আখ্যায়িকা মতে এই ভড়রাই বিধ্বস্ত হইয়া আভীর (আহীর) হইয়াছে। এই আহীরদিগের দেবতা হইতেছেন নাগবংশজাত শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহার

নবঘনমেঘবর্ণ আর্য্য এবং অনার্য্য উভয় জাতি হইতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য দ্যোতনা করে। শবরদিগের রাজ্য পূর্ব্বকালে বহু-বিস্তৃত ছিল। ভারতের ইতিহাসে যেমন আভীরেরা গুপ্তযুগে ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে রাজ্য অধিকার করিয়াছিল, তেমনি শবরেরা রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল মগধ প্রদেশে। যখন গাঙ্গেয় ভূমির পশ্চিম অংশে বঙ্গ, সুহ্ম, পুলিন্দ, শবর, কিরাত, পুণ্ড্র প্রভৃতি জাতি বিজিত হইয়া আগমন করে তখন তাহারা ঐ অঞ্চলে নূতন করিয়া কৃষ্টির গোড়াপত্তন করে। ক্রমশঃ ইহারাই ব্রাহ্মণ সমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হয়। আর্য্যীকরণেব ইহা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কৈবর্ত্তেরাও মনুসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে এবং বিষ্ণুপুবাণে তাহাদিগকে বলা হইয়াছে অব্রাহ্মণ। সকলেই জানেন এক সময়ে উত্তর ভারতে রাম-পালের রাজত্বকালে কৈবর্ত্তেবা প্রপীড়িত হইয়া দিব্যের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয় এবং রাজ্য অধিকার করে। ইহাতেই বাঙ্গলায় কৈবর্ত্তদিগের প্রতিষ্ঠা বুঝা যায়। কৈবর্ত্তেরাই মাহিষ্য নামে বাঙ্গলায়, বিশেষতঃ পূর্ব্ব বাঙ্গলায়, সুপরিচিত। কিন্তু বাঙ্গলার পূর্ব্বেকার এই যোদ্ধা, পবাক্রমশীল জাতি এখন সমাজে অনুচ্চ বলিয়া পরিগণিত। ডোম, চণ্ডাল এবং শবরেরা কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাসের আরম্ভ হইতেই অবনত বলিয়া পরিচিত। শবরেরা পর্ব্বত অঞ্চলে বাস করিত। ডোমদের সহরের বাহিরে থাকিতে হইত। তাহাদের মেয়েরা কানে দুল পরিত ও গলায় গুঞ্জাবীজের মালা এবং ময়ূরের পাখা ধারণ করিত। বল্লাল সেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে জানা যায় যে পুলিন্দেরা বাঙ্গলার

অভ্যন্তরে বা প্রান্তস্থিত জঙ্গলে বাস করিত এবং তাহাদের মেয়েরাও শবরীদিগের মত গুঞ্জাবীজের মালা পরিত। পাহাড়পুরের মূর্ত্তিগুলি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই জাতিদিগের একমাত্র আচ্ছাদন ছিল পর্ণের কটিবন্ধ। নারীদিগের বসনে ফুলের প্রচুর ব্যবহার ছিল। ইহারা স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিচারে সব সময়ে অস্ত্র ধারণ করিত। একটি মূর্ত্তিতে দেখা যায়, নারী তীর-ধনুক লইয়া শিকার করিতেছে।

জাতিসমূহের উত্থান-পতন

ইতিহাসের এইটাই বিদ্রূপ যে আজ যে জাতি বরেণ্য কাল তাহা নগণ্য। উত্তর ভারতে যুগযুগান্তকাল প্রবহমাণা গঙ্গা নদী এই বিদ্রূপের একই সঙ্গে কারণ ও সাক্ষী। পর পর উত্তরাপথে যতই সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল বিজেতা জাতিদিগের করতলগত হয় ততই বিজিত জাতিগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া পর্ব্বত অঞ্চলে, অরণ্যে কিংবা বহুদূরের বসবাসহীন জলাভূমিতে আশ্রয় লাভ করে। ক্রমশঃ কোথাও তাহারা ক্ষত্রিয়দিগের নাম লইয়া গাঢ়ওয়ালের খাসাদিগের মত সমাজে উচ্চস্থান ও উর্ব্বরা জমি অধিকার করিয়া জনসমাজকে শাসন করে, কোথাও বা মেদিনীপুরের খারওয়ারদিগের মত বনজঙ্গলে পশুর মত নিরাশ্রয় ও অসহায় জীবন অতিবাহিত করে, কোথাও বা ব-প্রদেশে অনধ্যুষিত ও অকর্ষিত সুবিস্তৃত উর্ব্বর ভূখণ্ড অধিকার করিয়া মাহিষ্য, কৈবর্ত্ত, পোদ ও নমঃশূদ্র জাতিদিগের মত অসম্ভব বংশবৃদ্ধি করিয়া দিকে দিকে প্রসারিত হয়।

গাঙ্গেয় ভূমির উত্তরে হিমালয়, এবং দক্ষিণে ও দক্ষিণ পূর্ব্বাঞ্চলে বিন্ধ্যগিরি ও ছোটনাগপুর উপত্যকা থাকাতে বিজয়ী জাতিদিগের পর্য্যায়ক্রমে সমতলভূমি অধিকার ও উপনিবেশ স্থাপন এবং বিজিত জাতি সমুদয়ের ক্রমশঃ পূর্ব্বাঞ্চলে বিস্তৃতিতে যে সমতা ও পারম্পর্য্য লক্ষিত হইয়াছে তাহা অন্য কোনও দেশে দেখা যায় নাই। ভারতবর্ষের এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। শীঘ্রই এই ইতিহাস লেখা না হইলে জনপ্রবাদ, আখ্যায়িকা প্রভৃতি উপাদান অচিরেই লুপ্ত হইয়া যাইবে; তখন এই ইতিহাস আর লেখা যাইবে না।

পাঠান ও রাজপুত অভিযানের শেষ অধ্যায়

আমরা ভারতের যে ইতিহাস পড়ি তাহা রাজা ও রাজন্য-বর্গের ইতিহাস। ভারতের জনগণের ইতিহাস অনুধাবন করিতে গেলে জানিতে পারা যায় যে, প্রথমে সমগ্র উত্তর ভারতে যে আদিম কৃষকসমাজ শবর, পুলিন্দ, আভীর, ভূঁইহর, পাশি, আরক, চেরো, ডোম, খেরওয়ার প্রভৃতি লইয়া গঠিত ছিল তাহা দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ভারতের মুঘল বিজয় পর্য্যন্ত বিভিন্ন রাজপুত বংশের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। কান্যকুব্জ হইতে ভারতবর্ষে পাঠান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় রাজপুত উপজাতিসমূহ সমস্ত উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে চৌহান, রাঠোর, সূর্য্যবংশী, সোমবংশী, হৈহয়, কৌশিক প্রভৃতি নানা রাজপুত বংশাবলী যুক্তপ্রদেশ ও বিহার

অঞ্চল অধিকার করিয়া সমস্ত সমতল ক্ষেত্র ভাগাভাগি করিয়া লইল। ভড় প্রভৃতি কোন কোন আদিম জাতি কোথাও হীনতা বা বশ্যতা স্বীকার করিল, কোথাও বা দক্ষিণে অরণ্য অঞ্চলে গিয়া চান্দেল নাম লইয়া এক শক্তিশালী বংশ গঠন করিল। তাহাদিগের কৃষ্টি ও সম্পদের নিদর্শন খজুরাহোর বিখ্যাত মন্দির ও শিল্পকলা। অন্যদিকে যে সব আদিম অধিবাসী রাজপুত অভিযানের ফলে উত্তরের জঙ্গলে কিংবা হিমালয়ের তরাইতে পলায়ন করিল তাহারা থারু, বাহেলিয়া, কেবত্ত ও চেরু নামে এখনও রাজপুতবংশীয় খাসাদিগের অধীনে ভূমি কর্ষণ করিতেছে।

বাঙ্গলা ও পশ্চিমের গ্রাম্যসমাজের প্রভেদ

বাঙ্গলার জলাভূমি ও নদীসৈকতে পুণ্ড্র, পুলিন্দ, শবর, কৈবর্ত্ত, কিরাত প্রভৃতি যে সকল আদিম অধিবাসী পলাইয়া বাঁচিল, তাহারা নূতন দেশে তাহাদের নিজস্ব গ্রাম্য সমাজ ও কৃষ্টির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল। গাঙ্গেয় ভূমির মধ্য-প্রদেশ ও বাঙ্গলার গ্রাম্য সমাজবিন্যাসের প্রভেদের মূল এই। উত্তর ভারতে বংশ, বর্ণ ও কৃষ্টি হিসাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বৈষম্য খুব বেশী, কারণ এখানে সমাজবিন্যাসে জেতা ও বিজেতা, ভূস্বামী ও কৃষকের প্রভেদ আসিয়াছে। কয়েকটি যুদ্ধনিপুণ বংশ জমি ভাগ করিয়া লইয়াছে; তাহারাই গোচারণ-ভূমি ও জঙ্গলের স্বামিত্ব ভোগ করে। অপর দিকে তাহাদিগের নিম্নস্তরে একটি কৃষকসমাজ প্রজা ও হলবাহী হিসাবে

তাহাদিগকে পোষণ করে। সমাজক্ষেত্রেও উচ্চজাতিরা সকুল্য বিবাহ অবলম্বন করিয়া সাধারণ সমাজ হইতে আপনাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর ভারতে জাতিভেদ সুপ্রতিষ্ঠিত। কৃষিকার্য্যে উচ্চজাতির পক্ষে হল-চালনা ধর্ম্ম ও লোকাচার বিরোধী।

বাঙ্গলায় যখন বহু নিপীড়িত জাতি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়া নূতন আগ্রহে নূতন দেশ অধিকার করিয়া লইল তখন তাহারা এক প্রজাতন্ত্রমূলক গ্রাম্য সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিল। গোচারণ ভূমি ও জঙ্গল, এবং জলসেচের সরোবরের উপর সাধারণের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল।

বাঙ্গলায় সঙ্কর জাতি

পাল ও সেনদের আমলের ভূমিদান প্রসঙ্গে আমরা জানিতে পারি যে সাধারণ লোকেরা গোচর ভূমিতে কিংবা অপ্রহত ভূমিতে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করিতে পারিত। মুকুন্দরামের কাব্যে বর্ণিত আছে বাঙ্গলার কৃষকদের মধ্যে হাকিল গোপ ও বারুই জাতিই প্রধান। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বারোজীবির উল্লেখ আছে কিন্তু গোপ জাতিকে বলা হইয়াছে লেখক জাতি। মুকুন্দরামে ডোম, কোল, করণ ও মারাঠাদিগের উল্লেখ আছে অবনত জাতি হিসাবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ভড়, ডোম, কোল, বাগ্‌তিতা (বাগ্দী ?), চণ্ডাল, জোলা, হাড়ী ও ব্যাধদিগকে ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে। বাঙ্গলার মধ্যযুগের সাহিত্যে ইহাদিগের পরিচয় পাওয়া যায়। এখনকার পল্লীসমাজেও

ইহারা অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত। তথাপি উত্তর ভারতের মত জমির অধিকার সম্বন্ধে বৈষম্য না থাকায় বাঙ্গলায় আর্থিক শ্রেণীবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। অপরদিকে বাঙ্গলায় বহু অনুন্নত জাতির সমাগমে তাহাদিগের মধ্যে অন্তর্বিবাহ খুব চলিয়াছিল এবং নানা জাতির মধ্যে এই সংমিশ্রণ প্রচলিত হওয়ায় উত্তর ভারতের মত পৃথক-করণের পরিবর্ত্তে আদান-প্রদান, সমন্বয় ও সমীকরণ অধিক পরিস্ফুট। বাঙ্গালা দেশে যে পরিমাণে সঙ্কর জাতির উদ্ভব হইয়াছে ভারতবর্ষের অন্য কোথাও তাহা হয় নাই। করণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ছাড়াও অনেক প্রকার মিশ্র, সৎশূদ্র জাতি বাঙ্গলায় উদ্ভূত হইয়াছে। তাহা ছাড়া দেখা গিয়াছে নৃতত্ত্বের দৈহিক লক্ষণ বিষয়ে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ বাঙ্গলার অন্য জাতিদিগের সঙ্গে অন্য প্রদেশের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক মিলে। কায়স্থ, সদ্গোপ ও কৈবর্ত্ত বাঙ্গলার স্বদেশজাত এবং তাহাদিগের মধ্যেও খুব বেশী মিল রহিয়াছে। একই প্রতিবেশের প্রভাব ও রক্ত-সংমিশ্রণের ইহা ফল।

রক্ত ও কৃষ্টি সংমিশ্রণের অমৃত ফল

বাঙ্গলার রক্তসংমিশ্রণ বাঙ্গালীকে একদিকে যেমন কোল ও দ্রাবিড়ী জাতির অসাধারণ শিল্পকৌশল দিয়াছে, অপর দিকে বাঙ্গালীর মনে ও সংস্কৃতিতে একটা উদারতর দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করিয়াছে। বাঙ্গলার সমাজবিন্যাসে আমরা পাই একটা সাধারণ ও সহজ সামাজিক ঐক্য ও সদ্ভাব যাহা কখনও বর্ণ

ও শ্রেণীবিভাগকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। আরও পাই একটা নিছক ব্যক্তিস্বাধীনতা যাহা কি উচ্চ কি অনুন্নত সমাজে সবার উপরে মানুষকে স্থান দিয়াছে। কোন ধর্ম্মবিধি, কোন সামাজিক অনুষ্ঠান, এই মানবিকতার পূজাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। তাই বাঙ্গলার পারিবারিক জীবন ও ব্যবহার-শাস্ত্র সমস্ত ভারত হইতে বিভিন্ন। জীমূতবাহন বাঙ্গালীর ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতাকে পরিস্ফুট করিয়া বাঙ্গালীর পক্ষে যে নিয়ম-কানুন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গলার কম গৌরবের বিষয় নয়। বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও সাধন-পদ্ধতি ভারতের সনাতন অনুষ্ঠানপ্রিয়তার সম্পূর্ণ বিরোধী। বাঙ্গলার শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনবীতির মূলতত্ত্ব এই যে, মানুষের সমস্ত অন্তঃকরণ বৃত্তির প্রকাশের মধ্যে, ইন্দ্রিয় ভোগের মধ্যে, মানুষ আস্বাদন করিতে পারে অতীন্দ্রিয় ও তুরীয়ের নিবিড় স্পর্শ। "মনের মানুষ" হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া পৃথিবীর সমস্ত ভোগ-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, পৃথিবী হইতে আপনাকে নিবৃত্ত করিয়া নহে —জীবনকে পরিপূর্ণরূপে আস্বাদ করিয়া।

অধ্যাত্মজীবনে মনোময়তা ও সাহস

এই "মনের মানুষের" সন্ধানে বাঙ্গালী সর্ব্বদা ব্যাপৃত। এই "মনের মানুষ" কখনও দেখা দিয়াছেন স্নেহময়ী মায়ের নিকট বালগোপালরূপে, দীনার্ত্ত ও শরণাগতের নিকট জগদম্বারূপে, প্রেমবিহ্বলের নিকট প্রেমময় রাধাশ্যাম, হরগৌরী রূপে। আবার কখনও এই "মনের মানুষ" সংসারবিরাগী,

নির্ভীক সাধকের হৃদয় শ্মশানে রূপান্তরিত করিয়া শ্মশানবাসিনী শ্যামারূপে সেখানে নৃত্য করেন। মানুষের সকল প্রকার সম্বন্ধের আশ্রয় ও প্রতীক যিনি অরূপ, অতীন্দ্রিয় ও বিশ্বাতীত, তাঁহাকেই বাঙ্গালী রূপ দিয়াছে নানা মানুষের আকারে। দেবতা হইয়াছেন কখনও পুত্র, কখনও কন্যা, কখনও মাতা, কখনও পিতা, আবার কখনও স্ত্রী, কখনও স্বামী, কিন্তু সর্ব্বদাই প্রিয়তম, প্রাণসর্ব্বস্ব। অধ্যাত্মসাধনায় বাঙ্গালী যেভাবে মানুষের যৌন প্রকৃতির সহিত তুরীয় অনুভূতির সম্বন্ধ স্থাপনে নানাপ্রকার পথ অনুসন্ধান করিয়াছে তাহা জগতে ধর্ম্মসাধনার ইতিহাসে একান্ত অভিনব। বজ্রযান, সহযান ও একাভিপ্রায়ীর ভাব ও পদ্ধতি বাঙ্গলার সাধনপদ্ধতির সহিত একেবারে জড়াইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার সহজিয়া, বাউল, আউল প্রভৃতি যে ভাবে ইন্দ্রিয়ের পথকে আশ্রয় করিয়া অতীন্দ্রিয়কে খুঁজিয়াছে তাহা বাস্তবিক যেমন সহজ ও নির্ভীক তেমনি সমাজের পক্ষে নিতান্ত আশঙ্কাজনক। বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমবিকাশের শেষ সাধনপদ্ধতি যেমন ভারতবর্ষের বাহিরে চীন, তিব্বত ও নেপালে আশ্রয় পাইয়াছিল তেমনি ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাঙ্গলায়ও তাহা রহিয়া গেল। মহাযান ধর্ম্ম ও সাধনপদ্ধতি হইতেই প্রথম আসে একদিকে বাঙ্গলার মনোময়তা ও ভাবুকতা, অন্য দিকে সমাজবিন্যাসে জাতি ও কুলের প্রতি অবিশ্বাস। বাঙ্গালী যেমন সঙ্কর ও উদার, তেমনি ভাবুক ও নির্ভীক জাতি। বাঙ্গালীর মর্ম্মে মর্ম্মে মহাযান, তন্ত্রযান ও সহযানের মনোময়তা গাঁথিয়া রহিয়াছে।

সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন-সাং যখন বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন তখন তিনি এদেশে যে মহাযান ধর্ম্মের পরিচয় পাইয়াছিলেন তাহা তান্ত্রিক ভাব ও পদ্ধতির সংস্পর্শে একবারে রূপান্তরিত। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম হইতে নহে, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে বাঙ্গলাদেশ মন্ত্রতন্ত্রের ও শাক্তমতের পূর্ণ দীক্ষা লাভ করিয়াছিল—আজও কালী তারা 'মহাবিদ্যা' ও ছিন্নমস্তা তাহার সাক্ষ্য দেয়। তান্ত্রিক সাধনের উদারতা ও ইন্দ্রিয়-অতীন্দ্রিয়ের সমন্বয় যে বাঙ্গালীব মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে তাহার প্রধান কারণ মহাযান, বজ্রযান ও সহজযান বৌদ্ধমত কর্ত্তৃক তান্ত্রিক পথ অনুধাবন। বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, বগুড়া, বিক্রমপুর, ত্রিপুবা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় বজ্রযান দেবদেবীর বহুল পূজা বহু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এখনও গ্রামে গ্রামে বজ্রযানের এমন অভিনব মূর্ত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে যাহা ভারতের অন্য কোন প্রদেশে পাওয়া যায় না। কামাখ্যা, শ্রীহট্ট, পূর্ণগিবি ও উড্ডীয়ান (বজ্রযোগিনী ?) এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম সাধনের প্রধান কেন্দ্র ছিল, 'সাধনমালা' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। পরে ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই বৌদ্ধধর্ম্মই বাঙ্গলায় ভক্তি রসায়নে আপ্লুত হইয়া আবার নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের পূর্ব্বযুগে 'বোধিচর্য্যাবতার' নামক একটী সুন্দর ভক্তি-রসাত্মক বৌদ্ধগ্রন্থ বাঙ্গলায় রচিত হয়। কিন্তু সেন রাজত্বকাল হইতে বৌদ্ধেরা বাঙ্গলায় অপমানিত ও নিপীড়িত হয় ও অনেকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। অতি সহজেই বৌদ্ধের গুরু

ও চৈত্য বা স্তূপ উপাসনা ও মুসলমানের পীর ও গোর-পিরস্তি মিশিয়া গিয়াছে। আবার অনেক বৌদ্ধ আউল, বাউল, নাথ, অবধূত, কর্ত্তাভজার সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া হিন্দু সমাজে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া রক্ষা পাইয়া গেল। অন্যদিকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত বৌদ্ধ নেড়া-নেড়ীর দল রামকেলী ও খড়দহে বাঙ্গলার তদানীন্তন বৈষ্ণব সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রক্ষা পাইল—রূপসনাতন ও বীরভদ্রের উদারতার জন্য। ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়, রূপ ও অরূপের সন্ধান একসঙ্গে মিশাইতে গেলে ব্যভিচারের ভয় আছে। বাঙ্গলার বৌদ্ধ ও শাক্ত তান্ত্রিকদের ভৈরবীচক্র সাধনা ও নেড়া-নেড়ীর কলঙ্ক ইহার সাক্ষ্য দেয়।

কিন্তু ইহার পশ্চাতে আছে বাঙ্গলার আদিম, প্রাক্-ব্রাহ্মণ নিষাদীয় সভ্যতাপ্রসূত তান্ত্রিক ভাব ও সাধন, যাহা আজও পর্য্যন্ত বাঙ্গলার কি বৌদ্ধ, কি শৈব, কি বৈষ্ণব সব ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠানের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে এবং তাহাদিগকে মরমীর অনায়াসলব্ধ সহজ ও তীক্ষ্ণ প্রেরণা দান করিয়াছে। বাঙ্গালী এখনও পর্য্যন্ত পৌরাণিক ধর্ম্মের উমা, গৌরী ও পার্ব্বতী অপেক্ষা কালী, তারা ও দুর্গার শরণ লয়। বাঙ্গলার ধর্ম্ম, দর্শন ও শিল্পকলার প্রাণভূমি হইতেছে শক্তি-পূজা ও সাধন, যাহা কোন অষ্ট্রিক সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়া কত পূজা অনুষ্ঠানের দ্বারা সুসমৃদ্ধ হইয়া, কত যোগ ও কায়া-সিদ্ধির দ্বারা সুমার্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়, জড় ও প্রাণ, অণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের এক মরমীর প্রত্যক্ষ সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে।

বাঙ্গলার অধ্যাত্মসাধনের প্রধান বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য

এইখানে—গুহ্যতম শক্তি সাধন অবলম্বনে কায়ার মধ্যে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে, জীবনের মধ্যে অহরহ অতীন্দ্রিয়, তুরীয় ও শূন্যকে পূর্ণ আস্বাদ করা। বাঙ্গলার ধর্ম্মের পথ বিধি অনুষ্ঠানের বেড়া দিয়া ঘেরা, সুপ্রশস্ত রাজপথ নহে। বাঙ্গলার অতি গোপন কায়া-সাধন, অতি অভিনব দেহতত্ত্ব ও অতি সাহসিক শূন্যধ্যান বা নারী-সাধন যে ভাবে সমস্ত বাহ্যিক আচার ও অনুষ্ঠানকে বর্জ্জন করিয়া পরমতত্ত্বকে ধরিতে চায়, যে ভাবে বাঙ্গলায় সাধারণ জনসমাজ হইতে বাবা আউলী, পাগলা কানাইয়া, পাগলনাথী, পাঁচু ফকিরী, খুসী বিশ্বাসী প্রভৃতি নানা ধর্ম্মসঙ্ঘ সহজ ও আন্তরিক ভাবে পরমতত্ত্ব অনুধাবন কল্পে গড়িয়া উঠে তাহা জগতের ধর্ম্মেব ইতিহাসে যেমন অভিনব তেমনি নিবিড় ও সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞান-সম্মত।

গৌড়ীয় শিল্পরীতির বিশেষত্ব

যাহা অবাস্তব, যাহা অনধিগম্য, যাহা নির্লিঙ্গ, তাহাকে প্রতীক হিসাবে পুরুষ-প্রকৃতি বা যুগল-মূর্ত্তি ভাবে দেখিলে চারুশিল্পকলা একটা নবজীবন পায়। তাই বাঙ্গালী ভারতবর্ষের মধ্যে চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পে সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণতা, গভীরতা ও কমনীয়তার পরিচয় দিয়াছে। গুপ্ত চারুশিল্পের মত বাঙ্গলাব স্থাপত্যে আছে একটা গভীর স্তব্ধ তুরীয় ভাব, কিন্তু তাহার সঙ্গে মিশিয়াছে এমন একটা সহজ সরস কোমলতা ও মানবিকতা যাহা অজন্তায়, মথুরায়, সারনাথে ও ইলোরায় সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মানবিকতার

সহিত অলৌকিকতার এই অভিনব সম্মিলন বাঙ্গলায় কখনও ফুটিয়াছে মঞ্জুশ্রী ও প্রজ্ঞাপারমিতার নিবিড় সমাধি ও লীলায়িত বিলাসের সংমিশ্রণে, কখনও বা স্তব্ধ ও সমাহিত বুদ্ধ ও বিষ্ণুর প্রসন্ন ও উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে, কখনও বা শিবাঙ্কোপবিষ্টা উমার চঞ্চল লাস্যভঙ্গী ও উন্মুখ আত্মনিবেদনে।

পাল রাজত্বকালে বাঙ্গলার এই অভিনব গৌড়ীয় রীতি একদিকে যেমন নেপাল ও তিব্বত, অপরদিকে তেমনই অতি-পরিচিত বণিকের ও ধর্ম্মযাজকের সমুদ্রপথ ও বন্দর অতিক্রম করিয়া শ্রীক্ষেত্র, সিংহল, মলয়, শ্রীবিজয়, যবদ্বীপ, দ্বারাবতী ও চম্পায় তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সুমাত্রা বা শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের সহিত বাঙ্গলার যোগ খুব ঘনিষ্ঠ হয় এবং শৈলেন্দ্র সম্রাটের রাজগুরু হইয়াছিলেন গৌড়নিবাসী কুমারঘোষ। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, শ্যাম ও কাম্বোজে বাঙ্গলার স্থাপত্য অনেক পরিমাণে প্রাদেশিক শিল্পরীতিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বাঙ্গলাদেশ হইতে সিংহল এবং সেখান হইতে নাককবরম হইয়া শ্রীবিজয় (সুমাত্রা), যবদ্বীপ, দ্বারাবতী (শ্যাম), চম্পা (কামবোডিয়া) এবং দক্ষিণ চীন পর্য্যন্ত বহু-যুগ ধরিয়া খুব গমনাগমন ছিল। এই সকল সমুদ্রপথে কত না ধর্ম্ম, দর্শন ও চারুশিল্পকলা দিকে দিকে প্রসারিত হইয়াছিল। ভারতসাগরের পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য এশিয়ার কুচা, তুরফান ও মরু-উদ্যানগুলির মত ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তারের প্রধান অগ্র-কেন্দ্র ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সহিত বৃহত্তর ভারতের ও ভারত মহাসাগরের প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জের

সংযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া গঙ্গোপকূলবর্ত্তী তাম্রলিপ্তি এশিয়ার সর্ব্বপ্রধান বন্দর ছিল। বাঙ্গলার জাহাজ বঙ্গোপসাগর হইতে বাঙ্গলার শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী, বাঙ্গলার ধর্ম্ম, বাঙ্গলার কৃষ্টি ও বাঙ্গলার চারুশিল্পকলা সুদূর প্রাচ্য দেশসমূহে যুগের পর যুগ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। পশ্চিমেও তাম্রলিপ্তির সহিত গুজরাট ও সুদূর রোম ও ভূমধ্যসাগরের দেশসমূহের মধ্যে বহু বিচিত্র ও লাভজনক বাণিজ্যের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। উত্তরে নেপাল ও তিব্বতের পার্ব্বত্যপথ ও দক্ষিণে সিংহল, সুবর্ণদ্বীপ, মালয় ও যবদ্বীপের সামুদ্রিক পথ দিয়া বাঙ্গলার কৃষ্টি বহু শতাব্দী ধরিয়া দেশবিদেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এশিয়ার সভ্যতা বিকাশে বাঙ্গলার অবদান কম নহে।

বাঙ্গলার অধোগতি

তাম্রলিপ্তি ও সপ্তগ্রামের ধ্বংস

বাঙ্গলার সিক্তবসনা চঞ্চলা ভাগ্যলক্ষ্মী নদী ও সমুদ্রের কূলে কূলে যুগ যুগ ধরিয়া কত না আসন পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। নদ-নদীর গতি হ্রাস, বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন এবং ব-প্রদেশের উত্থান-পতনের সঙ্গে বাঙ্গলার বাণিজ্য, রাষ্ট্র ও কৃষ্টির বিশেষ সম্পর্ক। নদীর মোহানায় তাম্রলিপ্তি নগর ও বন্দরের যখন সমৃদ্ধি তখন বাঙ্গলার কৃষ্টির সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব। এ গৌরব নদীর অধোগতি হেতু একবারে বিলুপ্ত হইল। এখন নদী-পরিত্যক্ত বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষ বালুকাস্তূপের মধ্যে প্রোথিত। ৪১০ খৃষ্টাব্দে যখন চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্তি বন্দরে আসেন তখন তিনি এই বন্দরের বিদ্যা, অর্থ ও সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যখন তিনি দেশে ফিরেন (৪১২-৪১৩) তখন তাম্রলিপ্তি বন্দরে জাহাজে চড়িয়া তাঁহার চৌদ্দ দিন লাগে সিংহল পৌঁছিতে। সিংহল ছাড়িয়া নাককবরম দ্বীপ (নিকোবার) ও মালাক্কা হইয়া তিনি যবদ্বীপে পৌঁছিয়াছিলেন। জাহাজে তাঁহার সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী দুইশত বণিক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার পরও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সুদূর চীন, শ্যাম ও যবদ্বীপ হইতে বহু বণিক, শিক্ষার্থী ও ধর্ম্মযাজক তাম্রলিপ্তিতে অবতরণ করিয়া নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতির

বিদ্যাগার ও সংঘারামে আসিত। সপ্তম শতাব্দীতে ই-চিং শ্রীবিজয় হইতে উলঙ্গদিগের দ্বীপ (নাককবরম) স্পর্শ করিয়া সেখান হইতে আরও পনেরো দিনে তাম্রলিপ্তি বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন (৬৭৩) এবং তাম্রলিপ্তিতে এক বৎসর যাবৎ বৌদ্ধতীর্থ ও সংঘারামগুলি দেখিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে তাম্রলিপ্তি আগে যাহা "বেলাকূলে" ছিল এখন তাহা সমুদ্রের মোহানার অবনতির সঙ্গে সমুদ্রের একটি "খাড়ীতে" হঠিয়া গিয়াছে। তখন হইতে তাম্রলিপ্তির অবনতি স্থুরু হইল। তবুও যোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ঐ বন্দর ক্রমাবনতি সত্ত্বেও প্রাচীন গৌরব কিছু কিছু রক্ষা করিয়া আসিতেছিল।

তখনও ভাগীরথী নদী প্রাধান্য লাভ করে নাই। সরস্বতী, ভৈরব ও ভাগীরথী এই তিন প্রশাখায় গঙ্গা বিভক্ত হইয়া গঙ্গোপসাগরে তিনটি প্রধান মোহানার সৃষ্টি করিয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ সরস্বতীর মোহানায় অথবা সরস্বতী কপিলা, হল্‌দী বা রূপনারায়ণের সহিত মিলিত হইয়া বা নাম পরিবর্ত্তন করিয়া যে মোহানার সৃষ্টি করিয়াছিল সেইখানে তাম্রলিপ্তি বন্দর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সরস্বতীর অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধি বিনষ্ট হইল। যোড়শ শতাব্দীতে সরস্বতী ও ভাগীরথীর সঙ্গমে ত্রিবেণীর নিকট সপ্তগ্রাম মহাবন্দর অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে রাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ নামক এক ইংরাজ সপ্তগ্রামে আসিয়া ইহার সমৃদ্ধি দেখিয়া ইহাকে "পরীলোক" বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার

কুড়ি বৎসরের মধ্যেই এই বিশাল নগরী একবারে বিনষ্ট হইয়া গেল।

তাম্রলিপ্তি ও সপ্তগ্রামের অবনতির প্রধান কারণ গঙ্গার পূর্ব্বাভিযান ও ক্রমে পদ্মার সৃষ্টি। বাঙ্গলার ভৌগোলিক যুগান্তরের সূচনা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই; আর আশ্চর্য্য এই যে প্রায় এই সময়েই বাংলার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবন নবাগত পরাক্রমশালী পাঠান জাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

কৌলীন্য ও পাঠান বিজয়

পাঠান কর্ত্তৃক লক্ষ্মণ সেনের আশু পরাজয় ও বাঙ্গলার পরাধীনতার সূচনার কারণ কি, অথবা বাঙ্গলার স্বাধীন রাজ্যসমূহ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী পাঠান অভিযানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষাকল্পে পূর্ব্বে কি কারণে যোগ দেয় নাই, এ সম্বন্ধে ভারতের ঐতিহাসিকগণ সম্যক্ আলোচনা করেন নাই। পাল রাজত্বের সময় বাঙ্গলার গৌরবময় শেষ সুবর্ণযুগ। সেন রাজগণ বিদেশী ছিলেন; তাঁহাদিগের প্রভুত্ব স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণগণ। বাঙ্গলা দেশে পূর্ব্বে বিবাহ বিষয়ে বংশ ও জাতির অতিবিচার ছিল না; রক্তসংমিশ্রণও অবাধ ছিল। বাঙ্গলার পল্লীগীতি ও লোকসাহিত্যে আমরা জাতি-ভেদের সুকঠিন নিগড়ের পরিচয় পাই না। কনৌজের ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গলায় আসিয়া বহু বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তন করিলেন। সমস্ত পূর্ব্বভারতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে

যে ব্যভিচার ও (বৌদ্ধ চীনদিগের মত) অখাদ্যভক্ষণের প্লাবন বহিতেছিল তাহার বিরুদ্ধে সমাজের শীলতা রক্ষা করিবার জন্য সম্ভবতঃ আচারই তখন কৃষ্টিরক্ষার একমাত্র উপায় ছিল। কিন্তু সব দিক হইতে আচারের যথেচ্ছাচারিতা বাঙ্গলার বহু যুগপরম্পরালব্ধ সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে একেবারে পঙ্গু করিয়া দিল। অন্তর্জাতি বিবাহ নিষিদ্ধ হইল, বাল্যবিবাহ বা গৌরীদান সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, ব্রাহ্মণেতর জাতি উপেক্ষিত হইল। এই কঠোর সমাজ-গঠনে যাহারা বাধা দিল তাহারা দুর্ব্বিনীত বলিয়া কৌলীন্য হইতে বঞ্চিত হইল। নানাপ্রকার বিধিনিষেধে মানুষের দৈনন্দিন কর্ম্মও বাধা পাইতে লাগিল। এমন কি বাঙ্গলার যে সদাগরশ্রেণী সিংহল, সুবর্ণদ্বীপ, মালয়, আরাকান, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ ও গুজরাটের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের ফলে দেশকে সমৃদ্ধ ও আপনাদিগকে প্রভূত ধনশালী করিয়া তুলিত, তাহারাও সমাজে আদর পাইল না, বরং বণিক (বা বেনে) বলিয়া হীন ও নগণ্য পরিগণিত হইল। কৌলীন্যমর্য্যাদার লক্ষণগুলি ও কুলীনদিগের গণ্ডী ক্রমশঃ নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইল; অবশেষে সমাজ সব দিক হইতে গুণের আদর না করিয়া স্থান, কুল ও সম্বন্ধের উপর জোর দিয়া নির্জীব হইতে লাগিল। তবুও কুলজী গ্রন্থ হইতে জানা যায় বল্লাল সেনের সময় হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত কুলীন শ্রেণী-বিভাগ অন্যূন একশত বার সংশোধিত হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে বংশাধিকারই সমাজকে কঠিন,

অলঙ্ঘ্য বিধিনিয়ম ও গণ্ডী স্থাপনের দ্বারা খণ্ডবিখণ্ডিত করিয়া দিল।

পাঠানদিগের গঙ্গাধারা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব অভিযান ও আক্রমণ এমন সময় হইল যখন সমাজ ক্রমশঃ অচলায়তনের মত হইয়া আপনার শক্তি হারাইতে বসিয়াছে। এদিকে সেনরাজ অবাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া এবং লোকমত বল্লাল-কৌলীন্যের বিরুদ্ধে থাকাতে জনসাধারণ রাজত্ব পরিবর্ত্তনে কিছু-মাত্র বিচলিত হইল না। উপরন্তু বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণ দ্বারা এতই নিষ্পেষিত হইয়াছিল যে তাহারা পাঠানদিগের ব্রাহ্মণদলনে বরং প্রীতি লাভই করিয়াছিল। বাঙ্গলার বৌদ্ধেরা পাঠান আক্রমণকে দেবতার বিচার বলিয়া গ্রহণ করিল। অনেক নির্য্যাতিত বৌদ্ধ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইল। শূন্যপুরাণে আছে নিরঞ্জন বা বুদ্ধ নিজে যবনরূপ ধারণ করিয়া কালো টুপি পরিলেন এবং কামান হাতে লইলেন। দেবতাগণ তখন তাঁহার সহিত যোগ দিল "আনন্দে ইজার পরিয়া"। গণেশ হইল গাজি। কার্ত্তিক হইল কাজি। দেবতাগণই যেন মুসলমান হইয়া মন্দির ভাঙ্গিল এবং অমানুষিক অত্যাচার করিল। দেব, দ্বিজ ও মন্দিরবিরোধী পাঠানের প্রতি দেবত্বের এই আরোপ হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের অসদ্ভাবের চূড়ান্ত পরিচয়। কনৌজ হইতে আগত নূতন ব্রাহ্মণ-দিগের সামাজিক উৎপীড়নে ও নূতন বংশগর্ব্বের শ্রেষ্ঠতা স্থাপনে বাঙ্গলার জাতীয়তার ঐক্যগ্রন্থি একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল।

পাঠানেরা আসিয়া পল্লীসমাজকে আরও বিশৃঙ্খল করিয়া দিল। মুকুন্দরামের কাব্যে আমরা পাই যে ভূমির খাজনা আদায় করিবার জন্য দিহিদারেরা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক প্রজার খাজনার নিরীখ ঠিক করিয়া দেয়। ইহাতে পল্লীসমাজের পুরাতন সমূহদায়িত্ব লোপ পাইল ও পঞ্চায়ত শাসনও বিনষ্ট হইল। পতিত জমিকে কর্ষিত ভূমির অন্তর্ভুক্ত করিয়া, খাজনার হার অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিয়া এবং মাপ জোপ সংক্রান্ত অনেক প্রকার প্রতারণা করিয়া তাহারা কৃষককে মহাজনের কবলে পড়িতে বাধ্য করিল। এদিকে এই মহাজন "বেনেরা" সমাজের নির্য্যাতনের প্রতিশোধ লইতে কৃষক জাতির "যম" স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। কৃষকগণ যাহাতে পলাইয়াও না বাঁচিতে পারে তাহার জন্য গ্রামের চারিধারে চৌকীদার নিযুক্ত হইল। এইভাবে বাঙ্গলার কৃষকসমাজ ঘোর দারিদ্র্য ও নির্য্যাতনের ভারে পুরাতন সমূহতন্ত্র হারাইয়া বসিল।

পাশ্চাত্য প্রভাব

বাঙ্গলায় ফিরিঙ্গীর প্রভাব

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গলায় আসিল ফিরিঙ্গী অথবা পোর্টু্গিজ বণিক। ফিরিঙ্গীরা তখন মালাক্কা (১৫১১) ও অর্ম্মাজ (১৫১৩) জয় করিয়া এবং প্রাচ্য জগতের সমস্ত সমুদ্র পথ দখল করিয়া অতিলাভজনক মশলা বাণিজ্য করায়ত্ত করিয়াছে। বাঙ্গলায় সাতগাঁ ও চট্টগ্রামে, যাহাদিগের ফিরিঙ্গীরা নাম দিয়াছিল "ছোট বন্দর" ও "বড় বন্দর", সেখানে তাহাদিগের গোড়াপত্তনের সুবিধা দিল বাঙ্গলার নবাব মাহমুদের শের শাহসূরের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষাকল্পে ফিরিঙ্গীর সহিত সখ্যতা। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বঙ্গোপসাগরে ফিরিঙ্গীর আধিপত্য স্থাপন সহজ হইল যখন সে হুগলী, পিপলি, সেণ্টথম, নাগাপটম ও জাফনাপটম অধিকার করিয়া লইল। কোরমণ্ডল হইতে উড়িষ্যা ও বাঙ্গলা, সেখান হইতে আরাকান ও পেগু, এবং তাহার পর মালাক্কা ও সিংহল দেশের বন্দর অধিকার করিয়া ফিরিঙ্গীর নৌবহর সমস্ত প্রাচ্য জগতের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইল। ফিরিঙ্গীর ছাড়পত্র ছাড়া আরব বা ভারতীয় জাহাজের যাতায়াত অসম্ভব হইল। ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকেরও মশলার জন্য পূর্ব্বদিকে গমনাগমন কিংবা লোহিতসাগর এবং পারস্য উপসাগরে বাণিজ্যের প্রতিরোধ হইল। প্রায় সমস্ত ষোড়শ শতাব্দী

ধরিয়া এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ফিরিঙ্গী তাহার প্রাচ্য বাণিজ্যের একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল।

বাঙ্গলায় রাজা পরমানন্দ রায়ের সঙ্গে ফিরিঙ্গীর যে সন্ধি হইয়াছিল (১৫৫৯) তাহাতে এই সর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে ফিরিঙ্গী চট্টগ্রামের পরিবর্ত্তে বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিবে, এবং পরমানন্দের চারখানি জাহাজ বৎসর বৎসর একবার করিয়া গোয়া, অর্ম্মাজ ও মালাক্কা বন্দরে যাইবার অধিকার পাইবে। পরমানন্দ ফিরিঙ্গীকে চাউল, ঘি, তেল, আলকাতরা, চিনি এবং কাপড় হিসাবে উপঢৌকন দিয়া ফিরিঙ্গীর বশ্যতা স্বীকার করিবে। ক্রমে ক্রমে ফিরিঙ্গীদিগের অনেকগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র বাঙ্গলায় স্থাপিত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলার বারভুঁইয়াদিগের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সকলেরই মুঘল ভীতি ও বাণিজ্যস্পৃহা ফিরিঙ্গীর প্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছিল। হিজলি, তমলুক, হুগলী, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কাঠারব, শ্রীপুর, বাকলা, ভুলুয়া, চণ্ডীকান প্রভৃতিতে ফিরিঙ্গী তাহার সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

১৬১৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা যখন সুরাট, আগ্রা, মসলিপটম ও পেটাপলিতে সুপ্রতিষ্ঠিত তখনও সে ফিরিঙ্গীর ভয়ে বাঙ্গলায় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার কোন আশাই করে নাই। ঐ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ইংরাজ কারখানাধ্যক্ষ লিখিয়া পাঠাইয়াছিল, যে সমস্ত ছোটখাট বন্দর ফিরিঙ্গীর অধিকৃত সুতরাং বাঙ্গলায় বা গাঙ্গেয় ভূমিতে ফিরিঙ্গীর প্রভাব হেতু ইংরাজের

বাণিজ্যপ্রসার অসম্ভব। ফিরিঙ্গীর জাহাজ বঙ্গোপসাগর হইতে গঙ্গাপথে পাটনা পর্য্যন্ত একচেটিয়া ব্যবসা সংরক্ষণ করিত।

কিন্তু ফিরিঙ্গীর বাণিজ্যপ্রভুত্ব বাঙ্গলায় বহুকাল টিকে নাই। তাহার প্রধান কারণ উহার জলদস্যুতা ও নিষ্ঠুরতা। ফিরিঙ্গী মঘের সহযোগিতায় নিম্নবঙ্গে 'মঘের মুলুক' আনিয়াছিল এবং হুগলীকে ক্রীতদাস ক্রয়বিক্রয়ের একটী প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত করিয়াছিল। তাহা ছাড়া প্রত্যেক দেশী ও বিদেশী জাহাজ যাহা হুগলীতে পৌছিত তাহার উপর ফিরিঙ্গী কর স্থাপন করিয়াছিল এবং জোর করিয়া হিন্দুমুসলমানকে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিত। এই সব কারণে রাজা ও প্রজা উভয়ের নিকট ফিরিঙ্গী নিতান্ত ঘৃণিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং শাহজাহান যখন ফিরিঙ্গীকে হুগলী হইতে বিতাড়িত করিলেন তখন সকলেই স্বস্তি লাভ করিল। তবুও ফিরিঙ্গীর জলদস্যুতা শীঘ্র নিবারিত হয় নাই।

বাঙ্গলা দেশ হইতে চাউল, গম, চিনি, লবণ, আফিং ও কাপড় ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রপ্তানি করিয়া ফিরিঙ্গীরা সেখান হইতে মশলা ও তামা, সোনা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করিত। অর্থের ব্যবহারের প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং বাঙ্গলা ও কোরমণ্ডলেরই সম্পদ পশ্চিম দেশবাসীর পূর্ব্ব জগতে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার বিশেষ সহায় হইয়াছিল। জলদস্যুতা করিয়া এবং গরীব ছেলেমেয়েকে ক্রয় বা চুরি করিয়া হুগলীর বাজারে বা বিদেশে দাস হিসাবে বিক্রয় করিয়া

ফিরিঙ্গী এক যুগ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর মনে ঘোর আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। তবুও বহির্বাণিজ্যে দেশবাসীর উপকার হয়ই; তাহা ছাড়া বাণিজ্যের সঙ্গে ফিরিঙ্গী বাঙ্গলার কৃষিক্ষেত্রে দান করিয়াছিল তামাক, আলু ও হিজলি বাদামের চাষ, এবং বাগানে পেঁপে, পেয়ারা, আনারস প্রভৃতি নানাবিধ সুস্বাদু ফল।

ওলন্দাজ বনাম ইংরাজ

ফিরিঙ্গীরা হুগলী হইতে ১৬৩২ সালে এবং হিজলি হইতে ১৬৩৬ সালে বিতাড়িত হইয়াছিল। ওলন্দাজ ও ইংরাজ দুই জাতি তখন বাঙ্গলায় বাণিজ্য ও প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পরস্পর বিষম শত্রুতা আরম্ভ করিল। ওলন্দাজেরা পূর্ব্বেই ভাগীরথী নদীর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া বসিয়াছিল এবং ইংরাজদিগের জাহাজ ভাগীরথী প্রবেশের সুযোগ বহু বৎসর পায় নাই। মসলিপতাম হইতে বঙ্গোপসাগরে হরিহরপুর এবং বালেশ্বরে (১৬৩৩) উপনিবেশ স্থাপন ইংরাজের বাঙ্গলা অধিকারের প্রধান সোপান আরোহণ। ফিরিঙ্গী ও ওলন্দাজের জলদস্যুতা, ভাগীরথী নদীর মোহানায় চড়া পড়াতে জাহাজ চালনের বিপদ এবং ওলন্দাজের নৌবহরের বঙ্গোপসাগরে অপ্রতিহত প্রতাপ ইংরাজের প্রতিপত্তির বিশেষ অন্তরায় হইয়াছিল।

১৬৫১ সালে হুগলীতে ইংরাজের কারখানা স্থাপিত হইলেও ইংরাজের ভাগীরথী নদীতে অবাধ প্রবেশের জন্য প্রায় ৩০ বৎসর লাগিল। কাপ্তেন ষ্ট্রাফোর্ড ১৬৭৯ সালে প্রথম

ইংরাজ জাহাজ লইয়া বালেশ্বর হইতে ভাগীরথী প্রবেশ করেন এবং নদীতে চড়াপড়া ও জোয়ার ভাঁটা সম্বন্ধে অত্যাবশ্যক তথ্য সংগ্রহ করেন। যখন ইংরাজ ১৬৯৮ সালে সুতানতি এবং অন্যান্য গ্রাম ক্রয় করিয়া কলিকাতা প্রতিষ্ঠিত করে তখন মসলিপতাম ও মান্দ্রাজ তাহার প্রাচ্য বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল। কলিকাতা তখন নগণ্য গ্রাম। কিন্তু ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বকূলে ইংরাজ কলিকাতায় মারাঠাদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল এবং মোহানার নিকটবর্ত্তী হওয়াতে এখান হইতে ওলন্দাজ, ফরাসী এবং বাঙ্গলার নবাবের সহিত যুঝিবার তাহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

ইংরাজ বনাম ফরাসী

ইংরাজ একই সঙ্গে তিনটী প্রধান ভৌগোলিক সুবিধাজনক সমুদ্রকূলে—গুজরাট,কোরমণ্ডল এবং বাঙ্গলায়—প্রভুত্ব স্থাপনের সুযোগ পাইয়া সমগ্র ভারতজয়ের বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিল। প্রত্যেক প্রদেশেই সে প্রথমে হিন্দু ও মুসলমান অপেক্ষা এবং পরে অন্য ইউরোপীয় বণিক অপেক্ষা বাণিজ্যশুল্ক খুব কম করিয়া লইতে পারিয়াছিল—সম্রাটকে অথবা প্রাদেশিক শাসককে নানা প্রকার ঘুষ ও উপঢৌকন দিয়া, প্রলোভন অথবা ভয় দেখাইয়া। ইংরাজ কোম্পানী ১৬৯৮ সালে বিলাতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল : "কোম্পানী ফারমান, দানপত্র এবং সন্ধিসূত্রে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই অত্যন্ত বেশী বাণিজ্যসুবিধা ও শুল্ক হইতে একপ্রকার নিষ্কৃতি লাভ

করিয়াছিল যাহা অন্য ইউরোপীয় বণিক শুধু নহে, এমন কি দেশীয় বণিকরা পায় নাই।"

বাণিজ্য-বিস্তার ও দেশ-অধিকার দুইয়েরই প্রতি ইংরাজের প্রথম হইতেই সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন ইংরাজের ভারতবর্ষ জয় অজ্ঞাতভাবে হঠাৎ ঘটিয়াছিল। ইহা ঠিক নহে। তিনটি সুবিধাজনক সমুদ্রকূলে, গুজরাট, কোরমণ্ডল ও বাঙ্গলায়, ইংরাজ প্রথম হইতেই বাণিজ্যে একাধিপত্য ও প্রাদেশিক শাসন অধিকার খুঁজিতেছিল। ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী অপেক্ষা ক্রমে যখন প্রবলতর নৌবহর সংগঠন করিতে পারিয়াছিল তখন হইতেই বঙ্গোপসাগরে প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া সে যে শুধু বাঙ্গলার রাজা হইবে তাহা নহে ভারতেরও রাজা হইবে উহা স্থিরীকৃত হইয়া গেল। কিন্তু ইংরাজ নিজে প্রথমে ভাবিয়াছিল গুজরাটেই তাহার রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু তাহা ঘটে নাই, কারণ ইংরাজ মারাঠাদিগের মত স্থলযুদ্ধে বলীয়ান্ ছিল না, তথাপি ইংরাজের সুরাট অধিকার মারাঠার পরাক্রমকে দমাইয়া রাখিয়াছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুরাট ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। হিন্দুস্থান, দক্ষিণ আরব, পারস্যদেশ, চীন ও ইউরোপের দ্রব্য-সম্ভার সুরাটের বাজারে ক্রয়বিক্রয় হইত। ডুপ্লে ভাবিয়াছিলেন ফরাসীর রাজসিংহাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবে কোরমণ্ডলে ও কার্ণাটিক প্রদেশে। ফরাসীরা ইংরাজের মত স্থল-প্রবল নহে, সমুদ্র-প্রবল জাতি। তাই ডুপ্লের স্বপ্ন অলীকে পরিণত

হইল। কিন্তু ক্লাইভ যে ভারত বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন গাঙ্গেয় ব-প্রদেশ অধিকার আশ্রয়ে তাহাই ইতিহাস সত্যে পরিণত করিল।

কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে, ইংরাজের বঙ্গোপসাগরে প্রভুত্ব স্থাপনের পক্ষে মসলিপতাম ও মান্দ্রাজ প্রথম অবলম্বন হয়। তাহার পর উড়িষ্যার উপকূলে হরিহরপুর, কটক ও বালেশ্বর। হুগলী স্থাপনের পর (১৬৫১) ভাগীরথীর মোহানায় ইংরাজের পূর্ণ অধিকার আসিতে প্রায় একশত বৎসর বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এবং এক সময়ে (১৭৪৬) যখন লাবুরডনে মরিশাস্ দ্বীপকে আশ্রয় করিয়া ইংরাজ নৌবহরকে বঙ্গোপসারে যুদ্ধে আহ্বান করিল এবং উহা হুগলী বন্দরে পলাইয়া বাঁচিল এবং অব্যবহিত পরে লাবুরডনে যখন মান্দ্রাজ অধিকার করিয়া বসিল, তখন ইংরাজ বা ফরাসীর মধ্যে কে ভারতেশ্বর হইবে তাহা নিতান্ত অনিশ্চিত ছিল। কিন্তু লাবুরডনের দেশে প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের দুশ্চিন্তা গেল, এবং ডুপ্লের স্থলাভিযানমূলক সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আকাশকুসুম হইল। এদিকে বাঙ্গালার নবাব দুর্দ্ধর্ষ আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু (১৭৫৬) এবং যুবক সিরাজদ্দৌলার হঠকারিতা ইংরাজকে বাঙ্গলায় নূতন ধূর্ত্তচাল ও বলপ্রয়োগের সুযোগ দিল। শুধু পলাশীর প্রাঙ্গণে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া নহে, প্রতিদ্বন্দ্বী সামুদ্রিক জাতি ফরাসীকে চন্দননগরের এবং ওলন্দাজকে চুঁচুড়ার ভাগীরথীবক্ষে নৌযুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইংরাজ বাঙ্গলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। অতি শীঘ্র এবং অতর্কিতে

ইংরাজ ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃষ্টতম প্রদেশ বাঙ্গলা জয় করিয়া তাহারই উৎপাদন, বাণিজ্যসম্পদ্ ও লোকবলে সমৃদ্ধিশালী হইয়া ধীরে ধীরে উত্তরপথে গঙ্গার শাখাপ্রশাখা বাহিয়া পাটনা, কাশী, অযোধ্যা, আগ্রা ও দিল্লী জয় করিতে পারিয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে সামুদ্রিক যুগে ভারতবর্ষের রাজতোরণ হইতেছে বাঙ্গলা। বাঙ্গলা হইতেই নদী ও সমুদ্রের পথে বিশাল ভারত জয় সম্ভব। আধুনিক যুগেও জাপানীদের ক্রমে আণ্ডামান, নিকোবার, রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুর এবং সিংহলে ও বাঙ্গলায় অভিযান তাহার সাক্ষ্য দেয়।

ইংরাজ বণিকের প্রভুত্ব স্থাপন

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৬৫১) যখন ইংরাজ বণিক প্রথম বাঙ্গলায় প্রবেশ করে তখন বিশাল বাঙ্গলা পৃথিবীর বিপুল বাণিজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্র। সপ্তগ্রাম বিনষ্ট হইয়া হুগলী ও কাশিমবাজার তখন বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী বন্দর। সে সময়ে বাঙ্গলাদেশ হইতে চাউল, গম, চিনি, তেল ও ঘি পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জের সুমাত্রা, মালাক্কা ও মুণ্ডা দ্বীপ পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে সিংহল ও মালাবার পর্য্যন্ত রপ্তানি হইত। তাহা ছাড়া বাঙ্গলার গাড়া, মসলিন, কালিকো, তাফেতা, খাসা ও রেশম পশ্চিম এসিয়া ও সুদূর ইউরোপে নিয়মিত ভাবে চালান যাইত। ঢাকাই মসলিন স্থলপথে লাহোর হইয়া এবং সমুদ্রপথে মসলিপতাম, গোয়া, সুরাট ও অর্ম্মাজ বা কেইরো হইয়া খোরাসান, পারস্য ও তুর্কী পর্য্যন্ত রপ্তানি হইত। ঘোড়ার

সাজসজ্জাও পারস্য ও চীনদেশে নিয়মিত ভাবে চালান যাইত। সমগ্র এসিয়ার সপ্ত সমুদ্রে বাঙ্গলার বাণিজ্যতরীর গমনাগমন ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রায় একশত জাহাজ প্রত্যেক বৎসর হুগলি, ঢাকা, শ্রীপুর, বাকলা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দরে মাল বোঝাই করিয়া সুদূর প্রাচ্যে অথবা সিংহল বাহিয়া গুজরাটের বন্দর অনাহিলপত্তনের অভিমুখে গমন করিত। এই বহির্বাণিজ্য বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে আমরা কয়েকটি সামুদ্রিক স্থানের নাম পাই—যেমন, আবর্ত্তন (মার্টাবান), নীলাক্ষ (লাক্ষাদ্বীপ), নাকুট (নিকোবার) মালয়, শিবট্ট (শ্রীবিষয় বা শ্রীবিজয়), প্রলম্ভ (বা পালেম্বান্) ও ত্রিহট্ট (থারিক্ষেত্র অথবা আরাকান)। মোগল বাদশাহ ও প্রাদেশিক নবাবদের অদূরদর্শিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য এই বহু পুরাতন বিশাল বাণিজ্য ধীরে ধীরে ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকের করতলগত হইল। হিন্দু ব্যবসায়ীদের উপর তখন প্রভেদাত্মক নানা-প্রকার 'কর' ধার্য্য ছিল। দেশের আভ্যন্তরিক যাবতীয় চালানি মাশুল ও বহির্বাণিজ্যের শুল্ক হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাওয়ায় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংরাজ বনিকদিগের বিশেষ সুবিধা ঘটিল। বিদেশী বনিকদিগকে একচেটিয়া ব্যবসায় অধিকার দানে এবং অবিচারে হিন্দু বনিকরা ক্রমেই সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্যে পরাভূত হইতে লাগিল। উত্তরভারতে নদীপথে বাণিজ্য তখন কম

ছিল না। সুদূর আগ্রা হইতে যমুনা ও গঙ্গা বাহিয়া প্রায় দুইশত করিয়া নৌকা একজোটে লবণ, আফিং, সীসা, কার্পেট, প্রভৃতি লইয়া এটাওয়া, প্রয়াগ, পাটনা হইয়া নিয়মমত সপ্তগ্রামে আসিত। বাঙ্গলায় ফিরিঙ্গীর আগমন পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম হইতে বহির্বাণিজ্যের পথও উন্মুক্ত ছিল। ধনপতি সওদাগর যখন নানা পণ্য সজ্জিত করিয়া সমুদ্রপথে সিংহলের দিকে যাত্রা করিলেন, তখন রাত্রে তাড়াতাড়ি—

ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হরমাদের ডরে।

মোগলেরা নৌবহরের দিকে কোনও প্রকার মনোযোগ না দেওয়াতে ওলন্দাজ ও ইংরাজ জলদস্যুরাও অবাধে ভারতীয় বণিকদের জাহাজগুলি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। সরস্বতী নদীর পথ এই জলদস্যুদের দ্বারা এতই অধ্যুষিত ছিল যে বাঙ্গালী বণিকেরা আদিগঙ্গার পশ্চিম পথ দিয়া সমুদ্রে যাওয়া-আসা করিত। বাণিজ্যের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার নৌ-শিল্প ক্রমেই লুপ্তপ্রায় হইল। ইহাতে বাঙ্গলার সঙ্গে এশিয়া ও ইউরোপের মখমল, রেশম, তসর, গাড়া, রুমাল, খাসা, নয়নসুক, তাফেতা প্রভৃতির ব্যবসা সম্পূর্ণ ইংরাজের করায়ত্ত হইল।

বিশাল বাঙ্গলার শিল্প ও বাণিজ্য হইতে প্রভূত লাভ এবং পলাশীর যুদ্ধ ও দেওয়ানী গ্রহণের পর লুটের অর্থ ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব ও জাগতিক ব্যবসা প্রসারের বিপুল অর্থের যোগান দিয়াছিল। ইংলণ্ডের আর্থিক প্রগতি ১৭৬০ হইতে ১৮১৫

পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষিত হইয়াছিল। ঠিক এই সময়েই বাঙ্গলার শিল্প, ব্যবসায় ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের অতি দ্রুত ও প্রভূত অধঃপতন লক্ষিত হয়। রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের সহিত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ও বাঙ্গলার দুর্গতির কারণ।

বাঙ্গলার বিপর্য্যয়

বাঙ্গলায় ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লব

আধুনিক যুগের কলিকাতা নগরীর মত অতীত যুগে বাঙ্গলার কৃষ্টি ও বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল ক্রমে ক্রমে তাম্রলিপ্তি, গৌড়, চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম, হুগলি ও কাশিমবাজার। হুগলি ও কাশিমবাজার বন্দর বহুকাল যাবৎ সপ্তগ্রামের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। সরস্বতীর পর ভাগীরথীরও অতি দ্রুত অধোগতি দেখা দিল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে। ইহা পদ্মা নদীর দ্রুত বৃদ্ধি ও পূর্ব্ব অভিযানের ফল, যাহার সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দেশ আমরা পাই কৃত্তিবাসের পদ্মাবতীর বর্ণনায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলায় একই সঙ্গে আবার ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক নূতন বিপ্লব আসিল। ১৭৭৬ সালে দামোদর তাহার পুরাতন পথধারা ত্যাগ করিবার ফলে ভাগীরথা আরও দ্রুত অধঃপতনের মুখে চলিল। শুধু ভাগীরথী নহে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই মধ্যবঙ্গের সমস্ত নদী—ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা—বর্ষাকাল ছাড়া অন্য ঋতুতে গমনাগমনের অনুপযোগী হইয়া পড়িল। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত কাশিমবাজার জগতের সর্ব্বপ্রধান তন্তুবয়নের কেন্দ্র ছিল। উহাকে সপ্তদশ শতাব্দীর ম্যানচেষ্টার বলা যাইতে পারে। চতুর্দ্দিকে নদীবেষ্টিত কাশিমবাজার "দ্বীপ" তদানীন্তন ইউরোপীয়

বণিক ও কারখানাধ্যক্ষদিগের স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের প্রধান স্থান ছিল। এখানে ওলন্দাজ ও ইংরাজদের কারখানা ছিল এবং নিকটবর্ত্তী ভাগীরথীকূলে সৈদাবাদে, ফরাসীদিগের কারখানা ছিল। এখান হইতে প্রভূত পরিমাণে রেশম, রেশমের কাপড় এবং নানাবিধ সূতার কাপড় এশিয়া ও ইউরোপে রপ্তানি হইত। কাশিমবাজারের রেশম পাটনা, আগ্রা ও গুজরাটে রপ্তানি হইয়া নানাবিধ শৌখীন কাপড় তৈয়ারীর উপকরণ যোগাইত। ইউরোপে যে সকল কাপড় বা মসলিন কাশিমবাজার হইতে রপ্তানি হইত, তাহাদিগের বাজারনাম প্রদত্ত হইল—পীতাম্বর, দড়িয়া, চন্দ্রবেণে, তাফেতা, ফুল দেওয়া লুঙ্গি, তারামণ্ডল, গার্ডেল, সুসি, ও ইলাচি। যে কাশিমবাজার দ্বীপ পূর্ব্বে অতি সমৃদ্ধিশালী অট্টালিকাবহুল ও স্বাস্থ্যপ্রদ নগর ছিল, নদী মজিয়া গিয়া অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগেই তাহা ক্রমশঃ রোগে জীর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। বাঙ্গলায় প্রথম ম্যালেরিয়া দেখা দেয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। এই সময়ে মুর্শিদাবাদের রাণী ভবানীর 'বড়নগর' একেবারে নিশ্চিহ্ন হইল। তাহার কিছু পরেই এই সকল জীর্ণ নদী সকলের কেন্দ্রস্থল যশোহর জেলা হইতে মহামারী উদ্ভূত হইয়া, শুধু এই জেলা নহে, ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে বর্দ্ধমান ও হুগলি জেলার গ্রামগুলি পর্য্যন্ত উজাড় করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে এই সময়ে অনেকগুলি নূতন নদী দেখা দিয়া সমগ্র সমতলক্ষেত্রকে আবার নূতন করিয়া গড়িতে আরম্ভ করিল। ভূমিকম্প ও জলপ্লাবনের ফলে ১৭৮৭ সালে ব্রহ্মপুত্র

নদ মৈমনসিংহ জেলা ছাড়িয়া যমুনার খাতে বহিতে লাগিল। আবার কীর্ত্তিনাশা ও নায়াভাঙ্গিনী নামে দুইটি নদী বিক্রমপুর ধ্বংস করিয়া পলিমাটির দ্বারা পুরাতন রাজধানী, মন্দির ও প্রাসাদের পরিবর্ত্তে নূতন গ্রাম ও নগর প্রতিষ্ঠা এবং কৃষির শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

প্রাচীন কেন্দ্রের ক্ষয় ও নূতনের সমৃদ্ধি

গঙ্গার ব-প্রদেশের নদী ও তাহার শাখাপ্রশাখাগুলির গতির হ্রাস ও বৃদ্ধি বাঙ্গলার ভবিষ্যৎকে আজ নিতান্ত আশঙ্কাময় ও অনিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। তাম্রলিপ্তি ও সপ্তগ্রামের পর যেমন হুগলি, তেমনি হুগলির পর বাঙ্গলার আধুনিক বাণিজ্য-কেন্দ্র কলিকাতা, ভাগীরথী ও বিদ্যাধরীর অবনতির জন্য নিজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ এখন কৃষি এবং লোকসংখ্যা হিসাবে ক্ষয়িষ্ণু। ইহা গঙ্গার পূর্ব্ব অভিযান এবং মধ্য বঙ্গের সকল নদীগুলির বিনাশের ফল। নদী মরিয়া যাওয়ায় ও জলনিকাশের বিঘ্নের জন্য সমগ্র বাঙ্গলাদেশের তিন ভাগের দুই ভাগ এখন স্বাস্থ্য ও কৃষি হিসাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যেমন মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে ১৯০১ হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ হুগলিতে কমিয়াছে শতকরা ৪৫, বর্দ্ধমানে ৪০, যশোহরে ৩১, মুর্শিদাবাদে ১৪ ও নদীয়ায় ৭, পূর্ব্ববঙ্গে ব-প্রদেশের যে সকল অংশে নদী জীবন্ত ও সমস্ত অঞ্চলকে নিয়মিতভাবে বিশাল জলপ্লাবনের দ্বারা সমৃদ্ধ করে, সেখানে

কর্ষিত ভূমির পরিমাণ খুব দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ঢাকা ও মৈমনসিংহে ৩০ বৎসরে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বাড়িয়াছে শতকরা ২৮, বাখরগঞ্জে শতকরা ২৭ ও ফরিদপুরে শতকরা ২১। যেখানে জলপ্লাবন অবাধ, এবং রাস্তা ও রেল নির্ম্মাণ জল-নিকাশের অসুবিধা ঘটায় না, সেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও কম। তাই পূর্ব্ববঙ্গের জেলাগুলিতে লোকসংখ্যা গত ত্রিশ বৎসরে শতকরা ২০ হইতে ৪০ বাড়িয়া গিয়াছে এবং পক্ষান্তরে ক্ষয়িষ্ণু ব-প্রদেশের জেলাগুলিতে হয় লোকসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে কিংবা খুব অল্পই বাড়িতেছে।

আর একটি অনুধাবনের বিষয় এই যে, উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব্ব বঙ্গের জেলাগুলির বেশীর ভাগেই অনুন্নত হিন্দু জাতি ও মুসলমানদিগের প্রাধান্য, এবং বাঙ্গলার যে অংশ এখন ক্ষয়িষ্ণু তাহাই বাঙ্গলার অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র এবং সেই-খানেই উচ্চ জাতিসমুদয়ের প্রাধান্য। এইভাবে প্রাচীন জনপদের বিলোপ ও অর্ব্বাচীন মুসলমানী ও অনুন্নত জাতি-দিগের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সমগ্র বাঙ্গলার কৃষ্টিকে রূপান্তরিত করিতেছে সন্দেহ নাই।

সংস্কৃতির রূপান্তর

কোন জাতির বা সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকসংখ্যার এইরূপ আকস্মিক বৃদ্ধি বা হ্রাস ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারাকে যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দেয় তাহার উদাহরণ ইতিহাসে অনেক মিলে। প্রাচীন রোমীয় সভ্যতার ধ্বংসের কারণ

সিরিয়া ও মিশর হইতে আগত দাসশ্রেণীর প্রাদুর্ভাব ও উত্তরাপথ হইতে আক্রমণকারী গথ্‌ ও বর্ব্বর জাতিসমুদয়ের অভাবনীয় প্রাবল্য। তেমনি ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে বহু বর্ব্বর জাতির অভিযান নানা দেশের ও সমাজের ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ধারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাই ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে গৌরবের কিছু নাই।

এই যে বাঙ্গলার কৃষ্টির অবশ্যম্ভাবী দ্রুত রূপান্তরের সূচনা হইতেছে তাহা ইহাতেই বুঝা যায় যে, আর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে প্রতি দশ জন লোকের মধ্যে কেবলমাত্র দুইজন হিন্দু দেখা যাইবে; তাহারও মধ্যে একজন নমঃশূদ্র, বাকী আট জন মুসলমান। সমগ্র বঙ্গে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে প্রতি দশজনের মধ্যে একজন উচ্চজাতির হিন্দু, ছয় জন মুসলমান এবং আর তিন জনের মধ্যে একজন মাহিষ্য, একজন নমঃশূদ্র ও একজন রাজবংশী অথবা অপর কোন জাতির লোক পাওয়া যাইবে। এখনই ত নোয়াখালি, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, রাজসাহী, চট্টগ্রাম ও বাখরগঞ্জে দশ জন লোকের মধ্যে সাত জন মুসলমান, এবং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জে প্রায় অর্দ্ধেক হিন্দু নমঃশূদ্র জাতীয়।

গাঙ্গেয় ভূমির প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়

গঙ্গার যুগযুগান্তকালের ধারার ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, মধ্যপথের অঞ্চলগুলির ক্ষয়বৃদ্ধি অধিক হয় নাই। মথুরা, প্রয়াগ, কৌশাম্বী, কান্যকুব্জ, অযোধ্যা, বারাণসী,

পাটলিপুত্র ও চম্পার ইতিহাস বহু পুরাতন ও নিত্য নূতন। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র উদয়নের রাজধানী কৌশাম্বী ও বৌদ্ধ যুগের রাজধানী কান্যকুব্জ বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু হিমালয়ের সানুদেশে গঙ্গার উপনদনদী সমূহের আহরণ-ভূমিতে, যেখানে বহু সমৃদ্ধিশালী রাজ্য যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেখানে এই নদীগুলির গতিধারার পরিবর্ত্তনে কালে কালে বহু বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছত্র, উত্তর কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তি, গোরক্ষপুর অঞ্চলের কুশীনগর, কপিলাবস্তু ও বৈশালী এবং বিদেহ রাজ্যের মিথিলা এইভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ জাতকে বর্ণিত রোহিণী ও ককুস্ত নদী, যাহারা বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে ও পর্য্যটনের সহিত বিজড়িত ছিল, তাহাদের আজ খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। তেমনি উত্তর বঙ্গে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (মহাস্থান), কোটিবর্ষ, পাণ্ডুনগর ও সোমপুর অঞ্চল এবং মধ্যযুগের রামাবতী ও গৌড় রাজধানী আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। উত্তর বিহার ও বঙ্গে কুশী, কমলা, করতোয়া, আত্রেয়ী ও তিস্তা-যমুনার খেয়ালমত গতিপরিবর্ত্তন শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সব অঞ্চলের জনসমাজ ও সংস্কৃতিকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে। হিমালয়ের ক্রোড়ে বৃষ্টিপাতের প্রাবল্য, জলপ্লাবন, ম্যালেরিয়া, জলাভূমি ও জঙ্গলের আকস্মিক প্রসারণ, ভূমিকম্পহেতু হঠাৎ ভূমির সমতলতার পরিবর্ত্তন এবং প্রধানতঃ নদীর বন্যা ও গতি-বিপর্য্যয়—এইভাবে বহু জনপদকে উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে।

শুধু পার্ব্বত্য উত্তরাঞ্চলে নয়, গঙ্গার সমগ্র ব-প্রদেশে, সমস্ত সমতল ভূমিতেই কালে কালে উত্থান-পতনের প্রচণ্ড লীলা চলিয়াছে। সেইজন্য বাঙ্গলা দেশে যত পুরাতন রাজধানী ছিল এবং যতগুলি বিনষ্ট হইয়াছে, এমন গাঙ্গেয় ভূমিতে কোথাও হয় নাই। তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ, ভুরীশ্রেষ্ঠী, মহানদ, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কোটীবর্ষ, রামাবতী, লক্ষণাবতী, ত্রিবেণী, বিজয়পুর, বিক্রমপুর প্রভৃতিকে এখন খুঁজিয়া পাওয়াই সুকঠিন।

উচ্চজাতির ক্ষয়

এক প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের কবলে পড়িয়া আজ বাঙ্গলা দেশের তিন ভাগের দুই ভাগ উৎসন্ন যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সমাজের জাতিভেদ, বংশভেদ, বিবাহের অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডী স্থাপন, বিধবা-বিবাহ নিষেধ, পণপ্রথা ও আরও অনেক সামাজিক বিধিনিষেধের অবশ্যম্ভাবী ফলে বাঙ্গলার উচ্চ জাতিগুলির ক্রমেই ক্ষয় ও ধ্বংস সূচিত হইতেছে। তাহা ছাড়া ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির সংখ্যা পুরুষজাতির অনুপাতে অত্যন্ত হ্রাস পাইতেছে। প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের স্ত্রী-সংখ্যা ৮৪৭ ও ৯০১ এবং ইহাদিগের বিধবার সংখ্যা ২০০। কিন্তু মাহিষ্য, মুসলমান ও নমঃশূদ্রের স্ত্রী-সংখ্যা ক্রমান্বয়ে ৯৫২, ৯৫৮ ও ৯৬৪। ১৮৮১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত, এই পঞ্চাশ বৎসরে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রত্যেকের সংখ্যা ১০ লক্ষ হইতে প্রায়

১৫ লক্ষ হইয়াছে; কিন্তু মাহিষ্যের সংখ্যা হইয়াছে ২০ লক্ষ হইতে ২৪ লক্ষ, নমঃশূদ্রের ১৬ লক্ষ হইতে ২১ লক্ষ, রাজবংশীর ৯ লক্ষ হইতে ১৮ লক্ষ। এই শেষোক্ত জাতিগুলি এখন সংখ্যায় ৬২ লক্ষের উপর,—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের মোট সংখ্যার দ্বিগুণ। ইহারা ছাড়া বাঙ্গলায় অনেক অনুন্নত জাতি আছে এবং অনুমান করা যায় যে, বাঙ্গলায় ১৫০ লক্ষ বাঙ্গালী উচ্চজাতির অনুশাসনে অপাংক্তেয় ও অস্পৃশ্য। অথচ তাহারাই বাঙ্গলার কৃষি, নদীপথে যাতায়াত, মৎস্যের ব্যবসায় ও নানা প্রকার কুটিরশিল্প বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

ইংরাজ আমলে নূতন পরাধীন মধ্যবর্ত্তিগণ

শুধু প্রাকৃতিক অভিশাপ নয়, সমাজের অর্থহীন বিধিনিষেধ, বিবাহ-বন্ধনে গুণ অপেক্ষা বংশকে অধিক মর্য্যাদা দান, নিম্ন শ্রেণীর নির্দ্দয় অবহেলা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা আজ বাঙ্গলার দুর্গতির কারণ। নির্ম্মম শাসনের ফলে বাঙ্গলার সমাজ শুধু নির্জ্জীব নয়, খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। সমাজবিন্যাসে অনুচ্চ ও উচ্চ জাতির এইরূপ ব্যবধান বাঙ্গলার যুগপরম্পরার্জ্জিত সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী, আমাদিগের উত্তরাধিকারের সহিত একবারেই সঙ্গতিহীন। অপর দিকে ইংরাজের নূতন রাষ্ট্র-বিন্যাসে বাঙ্গলার পুরাতন বণিক মধ্যবিত্ত ও শিল্পী শ্রেণী ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এক নূতন কেরাণী ও পেশাদার শ্রেণী গড়িয়া উঠিল।

যখন ইংরাজ প্রথম আসে তখন তাহারা দেশের বণিকদিগকে দাদন দিয়া নিযুক্ত করিয়া এদেশের তন্তুবায়দিগের তৈয়ারী

বস্ত্রাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিল। স্বাধীন সদাগর এইরূপে চুক্তিকারক দালাল ও পাইকারে পরিণত হইল। ক্রমে কোম্পানী ইহাদিগকে গোমস্তা, যাচনদার ও মুচুলকার হিসাবে নিযুক্ত করিয়া ইহাদিগের স্বাধীন বস্ত্রব্যবসা নির্ম্মূল করিয়া দিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহার বিলাতে প্রেরিত পত্রাদিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, উত্তর ভারতের স্বাধীন বণিকগণকে বিতাড়িত করিবার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে ও যাহারা সামুদ্রিক ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগের উপর নানা প্রকার চাপ দেওয়া হইতেছে। এদিকে কোম্পানীর গোমস্তা ও সিপাহীদিগের অত্যাচারে বাঙ্গলার তাঁতীশ্রেণী ইউরোপে বস্ত্র রপ্তানির প্রভূত বৃদ্ধি সত্ত্বেও, ইংরাজ অধিকৃত অঞ্চল হইতে পলাইতে লাগিল কিংবা তাঁত ছাড়িয়া কৃষিকর্ম্মে জীবিকার্জ্জন আরম্ভ করিতে লাগিল। অধিকন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রথম বৎসর হইতেই শুধু ইংলণ্ড নহে ইউরোপের অন্য দেশও ভারতীয় কালিকো, মসলিন ও রেশমের কাপড় আমদানীর বিরুদ্ধে ক্রমে নিষেধমূলক অত্যুচ্চ শুল্ক বসাইয়া বাঙ্গলার বাণিজ্য নষ্ট করিয়া দিল। ১৮৩৪ সালে ট্রেভেলিয়ান লিখিয়াছেন, যে এক ক্রোর টাকার বাঙ্গলার তাঁতের কাপড় যাহা পূর্ব্বে বিদেশে রপ্তানি হইত তাহা বন্ধ হইল, উপরন্তু ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় যাহা স্বদেশের বাজারে বিক্রয় হইত তাহার উৎপাদনও নষ্ট হইল বিলাতী কাপড় আমদানীর জন্য। তন্তুবায় শ্রেণীর মধ্যে ঘোর বেকার ও হাহাকার দেখা দিল। বস্ত্র শিল্প ও ব্যবসা বাঙ্গলায় অন্ততঃ

দশ লক্ষ লোককে অন্ন দিত,—উহারা নিরন্ন হইল। এদিকে বাঙ্গলার সঙ্গে পারস্য, খোরাসান, মিশর ও তুর্কীর যে বিপুল বস্ত্রবাণিজ্য ছিল, তাহাও মিশর, তুর্কী ও বাগদাদে রাষ্ট্রিক অশান্তি হেতু পূর্ব্ব হইতে মন্দা হইয়া আসিয়াছিল। বাঙ্গলার নৌশিল্প জলদস্যুতা ও ইংরাজের প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট হইল। নৌশিল্পের ধ্বংসের সহিত বহির্বাণিজ্য একেবারে চলিয়া গেল। কত শিল্প ব্যবসা মৃতপ্রায় হইল। কৃষির উপর জাতির একান্ত নির্ভরতা বাড়িয়াই চলিল। এই ভাবে বাঙ্গলার পুরাতন সমাজবিন্যাসে আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দিল।

অপরদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস ভূমিসম্পর্কীয় কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া আর এক নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি করিলেন। এই বন্দোবস্তের ফলে ক্রমে কৃষক শ্রেণীর উপর ধাপে ধাপে জমিদার, পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, চুকানিদার, দর-চুকানিদার, দর-দর-চুকানিদার প্রভৃতি নানা প্রকার খাজনা আদায়-সংক্রান্ত মধ্যশ্রেণীর প্রাচুর্ভাব হইল ও ক্রমেই জমিদার শ্রেণীর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যেমন জমিদার শ্রেণী গ্রাম ত্যাগ করিয়া আমলাদিগের উপর সব ভার দিয়া নিশ্চিন্ত এবং কৃষি ও কৃষকের সম্বন্ধে একপ্রকার উদাসীন, তেমনি গ্রামে এক নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেখা দিল, যাহারা ভাগবিলির আশ্রয়ে বিনা পরিশ্রমে ও বিনা মূলধনে জোতস্বত্ব ভোগ করিতেছে। তাহাদিগকে অনুকরণ করিয়া বিশেষতঃ মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ অঞ্চলে জোতদার কৃষকও শ্রমবিমুখ ভদ্রলোক সাজিয়াছে। ইংরাজের খাজনা আদায়ের সুবিধা হইল,

কিন্তু ভূমিস্বত্বের অংশীকরণ এবং কৃষির পোষ্য নানাবিধ মধ্যবর্ত্তীর সৃষ্টি হইয়া বাঙ্গলায় এক নূতন প্রকার শ্রেণীবিভাগ আসিল। ইহাতে যেমন কৃষির অবনতি, তেমনি নূতন প্রকার সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হইল।

নূতন শ্রেণীবিভাগ ও সংঘর্ষ

উনবিংশ শতাব্দীর এই নূতন শ্রেণীবিভাগ উত্তরোত্তর জমিহীন আধিয়ার, ভাগীদার ও মজুর শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়া এবং ভূমির অবাধ লেন-দেন বিষয়ে মহাজনকে প্রশ্রয় দিয়া যেমন পল্লীসমাজে একটি ঘোর আর্থিক ব্যবধান ও তাহার ফলে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি সমাজের নির্দ্দয় শাসন এই সব বঞ্চিত শ্রেণীদিগকে চিরদিনের জন্য জাতিচ্যুত ও পরিত্যক্ত করিয়া রাখিয়াছে। অর্থনীতি ও সমাজনীতির উপরে নূতন রাষ্ট্রিক নির্ব্বাচন-নীতি দেশে আবার নূতন ব্যবধান ও রেশারেশির সৃষ্টি করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে ইন্ধনের যোগান দিল।

বাঙ্গলাদেশে ১৯২১-১৯৩১ দশকে জোতদার ও রায়তের সংখ্যা ৯২ লক্ষ হইতে কমিয়া ৬০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। দশ বৎসরে শতকরা ৩৫ হ্রাস! অপর দিকে কৃষাণের সংখ্যা বাড়িয়াছে ১৮ লক্ষ হইতে ২৭ লক্ষ, অর্থাৎ শতকরা ৫০। ঐ সময়ের মধ্যেই ভূম্যধিকারীদিগের সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ৬½ লক্ষ হইয়াছে। ভূমির শোষকের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে কিন্তু ভূমির পোষকের সংখ্যা কমিতেছে। যে পোষক

তাহার জোতস্বত্ব মহাজন ও মধ্যবিত্তের কবলে যাইতেছে। ভূমিহীন কৃষাণ শ্রেণী সম্বৎসর কাজ পায় না, এই শ্রেণীর অনশন ও দ্রুত বৃদ্ধি সমাজে ঘোর অশান্তি ও বিক্ষোভ আনিয়াছে।

সমস্যা ও সমাধান

নদী নিয়ন্ত্রণ

আজ বাঙ্গলার সম্মুখে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এই ত্রিবিধ সুকঠিন সমস্যা। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক যেমন করিয়াই হউক একটা ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা উদ্ভাবন না করিলে এবং সর্ব্ববিধ ক্ষেত্রে তাহাকে কাজে পরিণত করিতে না পারিলে, বাঙ্গালীর সংস্কৃতির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। প্রাকৃতিক দিক হইতে নদী নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার প্রধান বিষয়। রাজমহলের মত উত্তরের কোন জায়গায় গঙ্গায় এবং দামোদরে প্রকাণ্ড বাঁধ বাঁধিয়া সেখান হইতে একই সঙ্গে জলপ্রপাতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি ও জলসেচের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাতে মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে নূতন কারখানাশিল্প প্রতিষ্ঠা, নল-কূপ খননের দ্বারা বর্দ্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতির জলসেচ এবং মৃত বা মৃতপ্রায় নদীতে নূতন প্রবাহ আনিয়া এই অঞ্চলের সংস্কার ও পুনর্জ্জীবন আনয়ন সম্ভব হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা ও দামোদরের ভীষণ বন্যার ক্ষতি নিবারিত হইবে। সেইরূপ উত্তর বঙ্গে তিস্তায় বাঁধ বাঁধিয়া প্রকাণ্ড কৃত্রিম সরোবর তৈয়ারী করিয়া আর একটি বৈদ্যুতিক পরিকল্পনা সম্ভবপর। সেখান হইতে সমস্ত উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে পাট, কাপড়, তেল, চিনি প্রভৃতির কারখানায় বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়োগ করিয়া ঐ অঞ্চলে এক বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে পারা যায়।

বিশাল বাঙ্গলা প্রতিষ্ঠা

বাঙ্গলার লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি, কৃষির উপর একান্ত নির্ভরতা ও শিল্প ব্যবসায়ের অধোগতি দেশকে ক্রমশঃ দারিদ্র্যের পথে টানিতেছে। তাহা নিবারণের প্রধান উপায় বাঙ্গালী-প্রধান মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা, শ্রীহট্ট ও কাছাড়—যে প্রদেশগুলি নানাবিধ খনিজ ও আরণ্য মাল-মশলায় পরিপূর্ণ, সেগুলিকে বাঙ্গলার ক্রোড়ে পুনরায় ফিরাইয়া আনা। এ দাবী শুধু বাঙ্গলার ভাষা ও সংস্কৃতির দাবী নয়, ইহা বাঙ্গলার দারিদ্র্য-মোচনেরও অবশ্য দাবী। বাঙ্গালীর ক্ষয় নিবারণের বিশিষ্ট উপায় হইতেছে বাঙ্গলাবিভাগ রদ ও বিশাল বাঙ্গলার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা এবং বাঙ্গলা-ভাষাভাষী মানভূম, সিংভূমকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালীর মূলধনে বার্ণপুর ও টাটানগরের ন্যায় নূতন নূতন সমৃদ্ধিশালী শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া তোলা। তবেই কৃষি ও শিল্প প্রসারের আজ যে ব্যত্যয় ঘটিয়াছে তাহার প্রতিরোধ হয়। শিল্পবিস্তার না হইলে কৃষির সম্যক্ উদ্ধার নাই। অপর দিকে যে সামাজিক অন্যায় ও অবিচারমূলক কায়েমী বন্দোবস্ত বাঙ্গলার পুরাতন রায়ত ও জোতদারকে ক্রমশঃ দৈনিক মজুর ও মুনিষ শ্রেণীতে পরিণত করিতেছে এবং এক শতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত কৃষকান্নপুষ্ট পরগাছা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বাড়াইয়া চলিতেছে, তাহার আশু রদ বা সংশোধনের প্রয়োজন। আজ ভূমি হইতে বিতাড়িত প্রায় ২৭ লক্ষ ভূমি-হীন মজুরকে অন্ন দিতে গেলে ভূমির কুপোষ্য, কৃষিবিমুখ

জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা কমাইতেই হইবে। তাহা না করিতে পারিলে বিভিন্ন সামাজিক স্তরের আর্থিক ব্যবধান ও তাহার ফলে সামাজিক বিদ্বেষ ও অশান্তি কখনই সমাজ-গ্রন্থিকে সুদৃঢ় করিতে দিবে না।

সামাজিক আদানপ্রদান

সমস্ত বাঙ্গলা দেশ জুড়িয়া বাঙ্গলায় হিন্দু, মুসলমান ও হিন্দুসমাজের উচ্চ ও অনুচ্চ জাতিসমুদয়ের মধ্যে আজ যে বিষম বিরোধ দেখা দিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন ও সামাজিক অধিকার প্রবর্ত্তনের একটা মহতী পরিকল্পনা শিক্ষিত সমাজের এখনই উদ্ভাবন করা উচিত। সামাজিক আদান-প্রদানে, হিন্দু ও মুসলমানের এবং উচ্চ বা অনুচ্চ জাতিব মধ্যে কোন ব্যবধান, সমবেত ভোজনে কোন বাদবিচার বা স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য প্রভেদ না থাকে সেদিকে সকলের সতর্ক দৃষ্টি থাকা চাই। ঘরে ঘবে উদারতর পারিবারিক নীতি ও অভিনব সামাজিক আচার-ব্যবহার অবিলম্বে গ্রহণ করিতে না পারিলে বাঙ্গলার ১ কোটী ৫০ লক্ষ অবনত ও পতিত জাতি বাঙ্গলার কৃষ্টিকে নীচের দিকে টানিয়া অতলে ডুবাইয়া দিবে। অপর দিকে উচ্চ জাতির যে ক্ষয়ের সূচনা হইয়াছে তাহা রোধ করিবার একমাত্র উপায় শুধু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যের অন্তর্বিবাহ নয়, সকল প্রকার বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনের গণ্ডীর প্রসারণ। এই অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের সূচনা সত্ত্বেও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে উচ্চজাতি কি এখনও মগ্ন,

রঘুনন্দন ও দেবীবর ঘটককে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে? উচ্চ ও অনুচ্চ জাতিদিগের-মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন ও পণপ্রথা রহিত করণ,—যাহা অনেক জাতির মধ্যে বিলম্বে বিবাহ ও পাপাচারের প্রশ্রয় দিয়াছে,—তাহা নিরোধ করিতেই হইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, পল্লীসমাজে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে অন্তর্বিবাহ যদি ধর্ম্মান্তরগ্রহণ-সাপেক্ষ না হয়, তাহা হইলে ইহা সামাজিক শান্তি ও সদ্ভাবের পরিপোষক হয়। অনেক অনুন্নত হিন্দু জাতি ও মুসলমান পল্লী অঞ্চলে কৃষ্টি ও সংস্কার হিসাবে একই স্তরের; উভয়ের মধ্যে বিধবাবিবাহও প্রচলিত। এই সব স্তরে ইহাদের মধ্যে বিবাহ অসম্ভব হইয়াছে কেবলমাত্র সামাজিক অনুশাসনের জন্য। যদি ধর্ম্মের সঙ্গে রাষ্ট্র নির্ব্বাচনের যোগ না থাকে এবং বিবাহের জন্য ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী না হয় (যেমন হইয়াছে চীন দেশে বৌদ্ধ-মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদির অন্তর্বিবাহে), তাহা হইলে এই প্রকার অন্তর্বিবাহে একদিকে যেমন বাঙ্গলার ঘোর কলঙ্ক নারীহরণের প্রতিরোধ হয়, অপর দিকে সামাজিক শীলতা ও সদ্ভাবও রক্ষা পায়।

বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলে আজও হিন্দুরা মহরম পর্ব্বে যোগ দেয়, পাঁচপীরের পূজা ও ফকিরকে ভক্তি ও সমাদর করে; মুসলমানেরাও গ্রামের মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা ও মনসা দেবীর মানত করে ও শিবের গাজনে আনন্দে যোগ দেয়। স্থানে স্থানে মুসলমানেরা অশৌচ পালন করে, নবান্ন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও জামাই-ষষ্ঠী পর্ব্ব অনুষ্ঠান করে। এইরূপে হিন্দু মুসলমানের

রীতি-নীতি ও ধর্ম্মভাব যে সামঞ্জস্যের পথে চলিতেছিল তাহা রাষ্ট্রিক কারণে প্রতিরোধ না করিয়া বরং সংরক্ষিত ও বিকশিত করিতে হইবে।

বিদ্রোহী বাঙ্গালী

বাঙ্গলার মাটি, মন ও সংস্কৃতি যুগে যুগে পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছে। বাঙ্গলার পলিমাটীতে মথুরা, কাশী বা পাটলিপুত্রের মত কোনও রাজধানী অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকে নাই। বাঙ্গলার পলিমাটী যেমন দেশকে ক্রমাগত নূতন ভাবে গড়িতেছে ও ভাঙ্গিতেছে, তেমনি গঙ্গার উত্তর-পশ্চিমের গোমুখীর তুষার-প্রস্রবণ হইতে বিপুল পূর্ব্ব প্রবাহ এবং তাহার বহু উপনদী ও শাখার খরস্রোত কালের পর কাল বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, উচ্চ ও অনুচ্চ জাতিকে প্রবল টানে সঙ্কুচিত ব-প্রদেশে টানিয়া তাহাদিগের রক্তসংমিশ্রণ ঘটাইয়াছে। বাঙ্গালীর এই রক্তসংমিশ্রণ তাহাব প্রধান গৌরব। ইহা হইতেই আসিয়াছে বাঙ্গালী মনের কমনীয়তা ও ঔদার্য্য। তাহা ছাড়া বাঙ্গলার মাটির, বাঙ্গলার জলের, বাঙ্গালীর প্রতিবেশের প্রভাব খুব প্রত্যক্ষ, খুব নিবিড়। বাঙ্গলার বিশাল নদনদীর উদ্দাম প্রবাহ মানুষের চিত্তকে বিচিত্র রঙের পালের নৌকার মত কোন্ সুদূরের সন্ধানে সদাই টানিয়া লয়। বাঙ্গলায় ছয় ঋতুর আবর্ত্তন আকাশে বাতাসে জলে স্থলে যে নূতন শোভা ও বৈচিত্র্য আনে তাহাতে কি কখনও কাহারও মন সুস্থির অচঞ্চল থাকে! অধিকন্তু দেখা দেয় কালবৈশাখীর

আকস্মিক তাণ্ডব লীলা, সুবিস্তৃত নদীবক্ষে অতর্কিত ঝঞ্ঝাবাত, নদীর আচম্বিত বিপুল বন্যা ও ভাঙ্গন, কিম্বা দিগন্তপ্রসারিত শান্ত স্নিগ্ধ শ্যামল ভূমির উপর মেঘ ও রৌদ্র, আলো ও ছায়ার নিত্য নূতন খেলা। সবই মানুষের প্রাণকে সদাই সতর্ক ও অস্থির করিয়া রাখে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী লীলাময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত বাঙ্গালীর সদাবিচলিত মনপ্রাণ চাহে 'নিতুই নব'। বাঙ্গালী তাই সব ক্ষেত্রে ভাবুক, উদার ও সেরা বিদ্রোহী। তাই আর্য্য সংস্কৃতি ও বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গলাতেই প্রথম ও প্রধান আশ্রয় পাইয়াছিল এবং যখন মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিল যে, গঙ্গার তীরে অসংখ্য বালুকণার মত সংসারের অসংখ্য জীবের নির্ব্বাণ না হইলে বুদ্ধের নির্ব্বাণ নাই, এই সার্ব্বজনীন মহান্ ভাব বাঙ্গলাই উদার প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল এবং নালন্দা, বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী সঙ্ঘারামে দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান, শীলভদ্র, শান্তি রক্ষিত প্রভৃতিকে সমগ্র এশিয়ার প্রজ্ঞানরাজ্যে বরেণ্য পদে সমাসীন করিয়াছিল। আবার কত যুগ পরে নবদ্বীপের প্রেমের কাঙ্গাল শ্রীচৈতন্য হিন্দু ও মুসলমান, উচ্চ ও অনুচ্চ জাতিকে এক প্রেমসূত্রে গাঁথিয়া যে নূতন সাম্যমূলক ধর্ম্ম ও সমাজবিন্যাস প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও শত দলে ও সম্প্রদায়ে, সভায় ও সঙ্কীর্ত্তনে, সুদূর ময়ূরভঞ্জ হইতে আসাম, ছোটনাগপুর হইতে বালেশ্বর পর্য্যন্ত কত প্রকার সুসভ্য ও অসভ্য জাতিকে সেবা ও প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছে।

সাম্যবাদী বাঙ্গালী

উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন শাক্ত ও সুফী, ইসাহী ও বৈদিক সাধন সম্মিলনে যে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মপদ্ধতি প্রচলন করিয়াছিলেন তাহাতেও আমরা পাই বাঙ্গলার সেই পুরাতন, সেই চিরনূতন সর্ব্বসমন্বয়ের বাণী। আজ আবার এই সাম্প্রদায়িক কলহ, এই আর্থিক ব্যবধান, এই সামাজিক বিরোধের মধ্যে আমরা চাই সেই উদারতম দৃষ্টিভঙ্গী, যাহা বাঙ্গালীকে নেপাল, তিব্বত, চীন, শ্যাম, কাম্বোজে ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও চারুশিল্পকলাব অগ্রদূত করিয়া পাঠাইয়াছে,—সেই নিবিড় ভক্তি যাহার বন্যা পবিত্র ব্রাহ্মণ ও পাপী জগাই মাধাই, সভ্য নাগরিক ও অসভ্য আরণ্য জাতি, সবাইকে একই প্রেমপ্লাবনে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছে। বাঙ্গলার মর্ম্মবাণী হইতেছে, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"। বিশ্বের কোন সংস্কৃতিতে মানুষের এমন মরমীয় রহস্যময় আত্মবিশ্বাস ও আত্মনিবেদন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্য ও মৈত্রীর ইহাই হইতেছে আসল বনিয়াদ। ইহা দার্শনিক বা সমাজনৈতিক ভিত্তি নয়, ধর্ম্মসাধন-প্রসূত অতি গভীর, অতি সূক্ষ্ম মরমীয় ভিত্তি। যাহা বিশ্বের জ্ঞান ও সাধনার ভাণ্ডারে বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব দান, তাহা বাঙ্গলার আজিকার জীবনমরণ সমস্যার দিনে আমাদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে সন্দেহ নাই।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ, রাষ্ট্রিক কলহ, অর্থনৈতিক ব্যবধান মিলিয়া আজ বাঙ্গলায় এমন একটি তুমুল বিদ্বেষের সৃষ্টি

হইয়াছে যে, ইহার সমাধান শুধু রাষ্ট্রিক, শুধু অর্থনৈতিক, শুধু সামাজিক পরিকল্পনায় হইতে পারে না ; সব দিক্‌কার বিরোধ নিবারণের প্রচেষ্টাকে একমাত্র সফল করিতে পারে বাঙ্গলার অধ্যাত্ম জীবনের সেই পরম সিদ্ধি—যাহা সংসারাতীত অপরোক্ষ অনুভব হইতে মানবিকতার বিশ্বজাল সৃজন করিয়া অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রিক ঐক্য সাধন ও সামাজিক সদ্ভাবকে দৃঢ়তর করিবে ; সেই মহতী তুরীয় অনুভূতি যাহা সমভাবে সকল প্রাণীর অভাব মোচন করিয়া সামাজিক সমতাকে একই সঙ্গে পরিরক্ষণ ও অতিক্রম করিবে।

শেষ

